Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নারী শিক্ষা ও ইসলাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া সুলতানা

রোলঃ 23100121735

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নারী শিক্ষা ও ইসলাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া সুলতানা

রোলঃ 23100121735

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নারী শিক্ষা ও ইসলাম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিয়া সুলতানা, আইডিঃ 23100121735 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নারী শিক্ষা ও ইসলাম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

সাদিয়া সুলতানা

আইডিঃ 23100121735

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা: 5
ইসলামে নারীর মূল্যায়ন: 6
ইসলামে নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা: 8
কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারীশিক্ষা: 12
শিক্ষা সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা : 13
নারী শিক্ষা সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা: 19
শিক্ষা সম্পর্কে হাদীসের নির্দেশনা: 22
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে নারী শিক্ষা: 26
সাহাবীদের যুগে নারী শিক্ষা: 31
তাবেয়ীদের যুগে নারী শিক্ষা: 36
উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে নারী শিক্ষা: 41
হাদীসচর্চায় মহিলা শিক্ষাবিদদের অবদান: 52
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীর পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থায়ন: 57
ইসলামে নারী শিক্ষা সম্পর্কে চার মাযহাব মতামত: 57
নারী শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামী যৌক্তিকতা: 58
নারী শিক্ষার ক্ষেত্র ও সীমা : 63
নারীর দ্বীন শিক্ষা না করার ক্ষতি: 66
উপসংহার: 71

ভূমিকা:

আল্লাহ তায়ালা প্রথম মানব আদম (আ) কে সৃষ্টি করলেন তারপর তাকে বিভিন্ন জিনিসের জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। মানুষের সৃষ্টির পরেই শিক্ষার মর্যাদা।ইসলামের শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরজ। ইলম ছাড়া আমল যেমন বাতিল আমল ছাড়া ইলম ও শূন্য।

মহান আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন (আলে ইমরান ১৯)। আর এই দ্বীনে মহান আল্লাহ নারীর মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। নর-নারীর সমন্বয়েই মানব জাতি। নারী জাতি হ'ল মহান আল্লাহর এক বিশেষ নেয়া'মত। আল্লাহ তা'আলা নারীকে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী হিসাবে মানব জীবন পরিচালনার জন্য পারস্পরিক সহযোগী করেছেন। ইসলাম মর্যাদার দিক দিয়ে নারীকে পুরুষের থেকে ভিন্ন করে দেখেনি।

ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়ের শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে সর্বপ্রথম শব্দ'' اقرا মানে 'পড়' নাযিল করেছেন (আলাক ১)। শিক্ষা ছাড়া কোনো উন্নতি সম্ভব নয়। একজন শিক্ষিত মা একটি শিক্ষিত জাতি গড়ে তুলতে পারে। একজন নারীর হাতে পরের প্রজন্ম নির্ভরশীল। নারী যদি অশিক্ষার অজ্ঞ জগতে থাকে স্বশিক্ষিত সন্তান থেকে জাতি বঞ্চিত থাকবে। তবে শিক্ষার প্রকারভেদ অনন্য। আর তা হল জাগতিক শিক্ষা ও পারলৌকিক শিক্ষা। এক কথায় দ্বীন ও দুনিয়াবি শিক্ষা। একজন নারীর উপর ফরজে পরিমাণ দ্বীন শিক্ষা করা ফরজ বিধান। কোনো নারী তা করতে সক্ষম নাহলে তিনি গুনাহগার হবেন। আর দুনিয়াবী শিক্ষার ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই যদি না তা ইসলামের সীমার বাইরে হয়। অর্থাৎ তা শর্ত ও সীমা রেখা মেনে চলবে। তবে এ ব্যাপারে ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ইসলামে নারীকে যেমন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে তেমনি উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে কোনো বাধা দেওয়া হয় নি। মূলত নারী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। একজন শিক্ষিত নারী মানে একটি শিক্ষিত পরিবার, আর একটি শিক্ষিত পরিবার মানেই একটি উন্নত সমাজ। একজন মায়ের কোলে গড়ে ওঠে ভবিষ্যতের নেতা, আলেম, বিজ্ঞানী কিংবা নীতিবান নাগরিক। তাই নারী যদি শিক্ষার আলোয় আলোকিত না হয়, তাহলে সমাজ অন্ধকারেই থেকে যাবে। ইসলাম নারীকে কেবল পর্দার অন্তরালে আবদ্ধ করে

রাখেনি; বরং তাদের জ্ঞানচর্চা, বুদ্ধিবৃত্তিক অংশগ্রহণ এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিয়েছে।

ইসলামে শিক্ষা কেবল ধর্মীয় শিক্ষায় সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামিক দৃষ্টিকোণে বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত, চিকিৎসা ইত্যাদি যাবতীয় উপকারী জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব রয়েছে। নারী যদি শালীনতা, পর্দা ও ইসলামি নীতিমালা মেনে চলে, তবে তাদের জন্য শিক্ষালাভ ও পেশাজীবনে প্রবেশে কোনো বাধা নেই। ইসলাম কখনোই নারীকে পেছনে ফেলে সমাজ গঠনের কথা বলেনি।

নারী শিক্ষা ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়; বরং তা একটি অপরিহার্য কর্তব্য। শিক্ষা ছাড়া নারী যেমন তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে না, তেমনি সমাজও তার পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জনে ব্যর্থ হয়। তাই আজকের দিনে ইসলামি আদর্শে নারী শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়া, নারীদের জ্ঞান ও গৌরবে অভিষিক্ত করা এবং অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করার মাধ্যমে একটি উন্নত, মানবিক ও আলোকিত সমাজ গঠন আবশ্যকীয়। ইসলামের আলোকে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেক এবং শিক্ষা দিয়ে প্রতিটি নারীকে গড়ো তোলা হবে সমাজের দীপ্তিমান নক্ষত্র।

ইসলামে নারীর মূল্যায়ন:

পৃথিবীতে সব কিছুই আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে এক একটা সম্পদ। আর এ সম্পদের মধ্য হতে সেরা সম্পদ হলো– নারী। রাসূলে কারিম (সাঃ) ইরশাদ করেন –

الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

অর্থাৎ–দুনিয়া পুরোটাই সম্পদ, আর দুনিয়ার সেরা সম্পদ হলো পূর্ণশিলা নারী। (মুসলিম শরীফ, হাদিস নং–১৪৬৭)

যে জিনিস যত বেশি মূল্যবান, তা রাখতে হয় ততটা সযত্নে ও সংগোপনে এবং তার ব্যবহারও করতে হয় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। মূল্যবান সম্পদকে কেউ অবমূল্যায়ন করে এখানে–সেখানে যেভাবে ফেলে রাখে না, যে কারো সামনে প্রকাশ করে না, যেন–তেনভাবে অবহেলা করে এটাকে ব্যবহার করে না। ঠিক তেমনিভাবে পৃথিবীর

শ্রেষ্ঠ সম্পদ নারীকেও বেপর্দাভাবে বাইরে বের হওয়া, যথেচ্ছায় এদিক সেদিক যাওয়া, যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো, যার তার সাথে দেখা—সাক্ষাৎ করা সবগুলোই তার অবমূল্যায়নের বহিঃপ্রকাশ।

মূল্যবান সম্পদ যেভাবে সংরক্ষণে অবহেলা হলে অথবা ব্যবহারে ত্রুটি হলে ঘটে অনিষ্টতা, ঠিক তেমনিভাবে নারীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং মূল্যবান জিনিসের মতো অতি মূল্যবান নারীকেও থাকতে হবে তার নির্দিষ্ট বলয়ে। হীরা, মুক্তাকে মানুষ কখনো যত্রতত্র ফেলে রাখে না, কোন ব্যক্তি যদি হীরা—মুক্তার মতো মূল্যবান জিনিসকে যত্রতত্র ফেলে রাখে তাকে কেউ জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান বলে না, বরং সকলের দৃষ্টিতে সে প্রমাণিত হবে নির্বোধ হিসেবে। নারী হীরা—মুক্তার চেয়েও বহুগুণ দামী। সুতরাং স্বাধীনতা, আধুনিকতা বা অধিকারের নামে তাকে যত্রতত্র ছেড়ে দেওয়া নির্বুদ্ধিতারই বহিঃপ্রকাশ।

সুতরাং নারীর জন্য যেভাবে শিক্ষা জরুরী, ঠিক তেমনিভাবে শিক্ষা দানের পরিবেশ ও পদ্ধতিও হতে হবে শরীয়ত সম্মত, নববী মানহাজ অনুযায়ী। শিক্ষার কারিকুলাম হতে হবে এমন যেখানে একজন নারী বাস্তবিক অর্থে'ই পরিণত হবে পৃথিবীর সেরা সম্পদে।

তার শিক্ষার ভিত্তি হবে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত ভিত্তিক এমন এক মানহাজ, যাতে সে মন থেকেই শরীয়তের পূর্ণ অনুসারি হবে, তার জবান হবে সংযত, সে হবে শরয়ী পর্দায় অভ্যস্ত, স্বামীর অনুগত, হবে সন্তান লালন—পালনে আন্তরিক, রান্না—বান্নাসহ ঘরোয়া কাজকর্মে সুদক্ষ এবং সন্তান প্রতিপালনসহ তার এবাদত বন্দেগিগুলোর শরযী বিধান সম্পর্কে সে হবে পূর্ণ জ্ঞাত।

একটি সন্তান মায়ের কাছ থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের যে সুশিক্ষা পেয়ে থাকে সেটাই তার জীবনে আদর্শের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য মূল ভিত্তি হয়ে থাকে। আর একজন মা তার সন্তানকে তখন'ই প্রাথমিক পর্যায়ের সুশিক্ষা ও আদব—কায়দা শিক্ষা দিতে সক্ষম হয় যখন দ্বীন সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানগুলো যথা— সন্তান লালন—পালন, নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিধানগুলো তার জানা থাকে। একজন নারী দ্বীনের আহকামগুলো না জানার কারণে নিজে যেভাবে দুনিয়া—আখেরাত উভয় জাহানে

ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তেমনিভাবে তার অভিভাবক ও অধীনস্তরাও তার কারনে দুনিয়াতে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা ও আখেরাতে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়। অপরদিকে একজন আদর্শ নারীর কারণে যেমনিভাবে তার অভিভাবকরা হয় দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত, তেমনিভাবে তার অধীনস্থরাও হয়ে থাকে উন্নত আদর্শে আদর্শিত।

কেননা একটি আদর্শ জাতি গড়ার ক্ষেত্রে আদর্শ মানুষের বিকল্প নেই, আর আদর্শ মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে একজন আদর্শ মায়ের বিকল্প নেই। আল্লামা নুরুল ইসলাম আদীব সাহেব(দা.বা.) এক বয়ানে বলেন— একটি সন্তানের দৈহিক গঠনের প্রায় ৯০ শতাংশই গঠিত হয় তার মায়ের দেহের নির্যাস মিশ্রিত পদার্থ দ্বারা। বাবার ওরশ থেকে যখন সন্তান মায়ের গর্ভে স্থানান্তরিত হয়, সন্তান গর্ভে আসার সাথে সাথেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন মায়ের দেহের রক্তের মাধ্যমে সন্তানের দেহ গঠিত হওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। এমনিভাবে সন্তান পৃথিবীতে আসার পর অন্ততপক্ষে দুই বছর পর্যন্ত যে দুধ পান করে থাকে সেটাও মায়ের দেহ নিঃসৃত। তথা এই সন্তানের দেহের প্রায় ৯০ শতাংশই গঠিত হয় মায়ের শরীরের অংশ দ্বারা। সুতরাং বাচ্চার দেহ গঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু মায়ের দেহ মিশ্রিত পদার্থের প্রভাব বেশি। তাই মায়ের স্বভাব, চরিত্র, প্রকৃতি বাচ্চার উপর স্বাভাবিকভাবেই খুব বেশি'ই প্রভাব বিস্তার করবে।

ইসলামে নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

দৈহিক এবং মানসিক ভিন্নতার কারণে দুনিয়াতে চলার ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্মের কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে বান্দেগীর ক্ষেত্রে সকলেই সমানভাবে আদিষ্ট। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

অর্থ: আর আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।

(সূরা যারিয়াত,আয়াত— ৫৬)

অর্থাৎ– ইবাদত বন্দেগী পালনে মহান রবের পক্ষ থেকে নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সমানভাবে আদিষ্ট। আর আমরা জানি, ইবাদাত বন্দেগী পূর্ণভাবে আদায়ের জন্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা অপরিহার্য। অর্থাৎ– যেটুকু না শিখলে ফরজ ইবাদাতগুলো পালন করা সম্ভব নয়, ততটুকু ইলম অর্জন করা প্রত্যকরে জন্য ফরয। যেহেতু ইবাদাতের ব্যাপারে নারী–পুরুষ উভয়েই আদিষ্ট, সেহেতু বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রেও অবশ্যই উভয়ের রয়েছে সমান অধিকার, অশগ্রহণের শরীয়ত সম্মত সুযোগ ও আবশ্যকীয়তা। যেমনিভাবে হাদিসে পাকে ইরশাদ হচ্ছে–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ

অর্থাৎ– প্রত্যেক মুসলমান নর–নারীর জন্য দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা ফরজ।
(সুনানে ইবনে মাজাহ–১/৩৫৭পৃঃ)

ইসলাম নারী শিক্ষার বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে, যা কোরআন হাদিসের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا..

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং আপন পরিবার–পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।
(সূরা–তাহরীম,আয়াত–৬)

উক্ত আয়াতে কারীমায় মহান রাব্বুল আলামীন– 'বান্দা নিজেকে এবং সাথে সাথে পরিবার–পরিজন' (তথা–মা–বোন, স্ত্রী–সন্তানদের)কেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্যে তাগিদ দিয়েছেন। জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার ইবাদত–বন্দেগী করতে হবে, আর আল্লাহর বন্দেগী করতে হলে অবশ্যই বান্দেগীর জন্য ইলমে দ্বীনের শিক্ষা অপরিহার্য। স্পষ্টতই নারীর দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম ।

এমনিভাবে শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, হাদিসে আছে–

عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عند حفصة فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة

অর্থ: একবার নবীজী সা. আমার কাছে আসলেন, আর আমি তখন হাফসা (রা.)এর নিকটে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি তাকে যেভাবে লিপিবিদ্যা শিখিয়েছো সেভাবে খুঁজলি—পাচড়ার চিকিৎসা পদ্ধতিও কেন শিখিয়ে দিচ্ছো না?
(আবু দাউদ—৩৮৮৭)

উক্ত হাদিসে হযরত শিফাকে লক্ষ্য করে রাসূল (স.)এর উক্তি ‘কেন শিখিয়ে দিচ্ছো না?’ থেকেই ইসলামে নারী শিক্ষার সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিষয়টি প্রতিয়মান হয়।

ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য, যেমনিভাবে পুরুষের জন্য অপরিহার্য। তবে উভয়ের জন্য শিক্ষার পরিবেশ হতে হবে ভিন্ন এবং উভয়ের উপযোগী শিক্ষা সিলেবাস হবে ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন। তবে উভয়ের শিক্ষার ভিত্তি হবে এক’ই। আর তা হলো—তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত। কেননা দুনিয়াতে ভূমিষ্ট হবার পর সে ছেলে হোক বা মেয়ে, উভয়কেই প্রথমে জানতে হবে তার ‘রব’ সম্পর্কে। অতঃপর জানতে হবে, তার ‘রব’ তাকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁর দাসত্বের জন্যেই। তাকে জানতে হবে দুনিয়াতে তার রবের পক্ষ থেকে তার উপর দেয়া দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে।

নারী—পুরুষ, উভয়ের আবেগ—অনুভূতি ভিন্ন। তাই দু’বছরের শিশুর মধ্যেও দেখা যায় যে, তাদের খেলনা পৃথক, পোষাক পৃথক ও খেলার সাথীও পৃথক। লক্ষ্য করলে আরো দেখা যায় যে, তাদের রুচি, দাবী ও মানসিকতাও ভিন্ন। কন্যা শিশু বাইরে যেতে চায় না, সে হাড়ি—পাতিল নিয়ে খেলা করে। ছেলে শিশু ঘরে থাকতে চায় না, সে বাস—ট্যাক্সির খেলনায় মেতে থাকে। মেয়ে শিশু বাপের বেশী আদরের হ’লেও মায়ের কোলে ঘুমাতে সে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। সুতরাং প্রাকৃতিকভাবেই যেহেতু নারী পুরুষের আবেগ—অনুভূতি, রুচি ও মানসিকতা ভিন্ন ভিন্ন । তাই ছোট থেকেই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও করতে হবে তাদের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী। তাদেরকে দিতে হবে তাদের রুচি, দাবি ও মানসিকতার অনুকূল পরিবেশ।

কেননা মাছ যেভাবে পানির বাহিরে নিরাপদ নয়, ঠিক তেমনিভাবে নারীও পর্দার বাহিরে নিরাপদ নয়। ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মাঝে রয়েছে নিজস্ব স্বাতন্ত্রতা ও স্বকীয়তা। যার থেকে বিপরীত পরিবেশে গেলেই সে বিব্রত বোধ করে। এমনিভাবে টাইট—ফিট, অর্ধনগ্ন পোশাক, বদ্বীনি ও বেপর্দার পরিবেশে তাদের উভয়ের মন—মস্তিষ্ক অবশ্যই সংকুচিত হবে। অপরদিকে সুস্থ—সুন্দর ও পর্দার পরিবেশে উভয়ের মন—মস্তিষ্ক হবে সুপ্রসন্ন। এর বিপরীত কিছু করতে গেলেই সেটা হয়ে থাকে তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ, যাতে ঘটে নানা বিপত্তি। ইসলাম নারী ও পুরুষের এই স্বভাবগত প্রবণতাকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং তাদের জন্য পৃথক শিক্ষা পরিবেশ ও শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষার গুরুত্ব নিচে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. জ্ঞান অর্জন ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা:

ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা কেবল পুরুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই জ্ঞান অর্জনের সমান অধিকার রাখে।

২. আদর্শ জাতি গঠনে শিক্ষিত মা:

পরিবারের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হলো মায়ের কোল। একটি শিক্ষিত পরিবার ও নৈতিকতাসম্পন্ন জাতি গঠনের জন্য শিক্ষিত নারী অপরিহার্য। শিক্ষিত মা তার সন্তানদের ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও আদর্শে গড়ে তুলতে পারেন।

৩. দ্বীন ও দুনিয়াবী শিক্ষার সুসমন্বয়:

ইসলাম শুধুমাত্র ধর্মীয় জ্ঞান নয়, বরং নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইতিহাস ও অন্যান্য সামাজিক জ্ঞান অর্জনেও উৎসাহিত করে, যদি তা পর্দা ও শরিয়তের সীমার মধ্যে থাকে।

৪. নারী অধিকার ও সচেতনতা বৃদ্ধি:

শিক্ষা নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে। ইসলাম নারীদের সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীন মতামত এবং সম্মানজনক জীবনযাপনের সুযোগ দিয়েছে, যা শিক্ষার মাধ্যমে তারা সঠিকভাবে জানতে ও রক্ষা করতে পারে।

৫. ইসলামের ইতিহাসে নারীর জ্ঞানচর্চা:

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীরা জ্ঞানচর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ ও মুহাদ্দিস। সাহাবী নারীরাও জ্ঞান অর্জন ও প্রচারে সক্রিয় ছিলেন।

৬. নৈতিকতা ও শালীনতা রক্ষা:

ইসলামী কাঠামোতে শিক্ষিত নারী তার পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি শালীনতা ও পর্দা বজায় রেখে সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

ইসলাম নারীকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার নির্দেশ দিয়েছে। একটি উন্নত, আদর্শ ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনে নারী শিক্ষা অপরিহার্য।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারীশিক্ষা:

কুরআন ও হাদীসে শুধু নারীশিক্ষার কথা পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়নি। শিক্ষা সম্পর্কে যে কথাই বলা হয়েছে, তা নর ও নারী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। নর ও নারীর জন্য আলাদাভাবে কোনো আলোচনা করা হয় নি। শিক্ষা প্রসঙ্গে যে নির্দেশগুলো দেয়া হয়েছে, তাতে সাধারণত পুরুষবাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "তুমি পাঠ কর তোমার প্রভূর নামে।" আর হাদীস শরীফে বলা হয়েছে "তোমরা বিদ্যা অন্বেষণ কর।" এখানে এই নির্দেশ কেবল পুরুষের জন্য নয়, বরং নর ও নারী উভয়ের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য।

শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, প্রায় সকল বিষয়েই কুরআন ও হাদীসে সাধারণ নির্দেশগুলো এভাবে পুরুষবাচক ক্রিয়াপদ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও এ দ্বারা নর ও নারী উভয়কেই সমভাবে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়

﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣ ﴾ [البقرة :٤٣]

"তোমরা নামায পড়, যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।"[1] এখানে ব্যবহৃত দু'টি ক্রিয়াপদই পুরুষবাচক। কিন্তু এর দ্বারা নর ও নারী উভয়কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা নামায পড়া এবং যাকাত দেওয়া নর ও নারী উভয়ের জন্য ফরয।

(সূরা আল বাকারাহ :৪৩।)

শিক্ষা সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা :

শিক্ষা, জ্ঞান ও বুদ্ধির মূল উৎস হলেন আল্লাহ। নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের কাছে শিক্ষা ও জ্ঞান পৌঁছে। আল্লাহ হতে প্রাপ্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে। এভাবে বিকশিত বুদ্ধি দ্বারা মানুষ চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতে থাকে। মানুষের সামনে তখন আল্লাহর সৃষ্টি রাজ্যে লুক্কায়িত অনেক রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। অজানা বহু বিষয় সম্পর্কে মানুষ জ্ঞান লাভ করে। সে অনেক কিছু আবিষ্কার করে এবং পৃথিবীকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলে। অতএব, আল্লাহ হতে প্রাপ্ত জ্ঞান বলেই মানুষ পৃথিবীকে সুশোভিত, সুসজ্জিত এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে সক্ষম হয়েছে।

মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম মানব জাতির আদি পিতা আদম (আ.)-কে সৃষ্টি রাজ্যের যাবতীয় জীবজন্তু, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-তরু, আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, বস্তু-পদার্থ প্রভৃতি সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান দান করেছিলেন। তাঁর মগজে আল্লাহ সকল বিষয়ের মৌলিক জ্ঞানের বীজ রোপণ করেছিলেন। যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় আদম সন্তানেরা তাদের আদি পিতার মগজে রোপিত জ্ঞান উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে থাকে। বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এ জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। আল্লাহর নিকট হতে সরাসরি প্রাপ্ত এ জ্ঞানের কারণেই আদম ও বনী আদম, ফেরেশতামণ্ডলী এবং সমগ্র সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। এ মর্মেই মহান আল্লাহ কালামে পাকে বলেছেন,

﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِي بِأَسۡمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٣١ قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ٣٢﴾ [البقرة: ٣١، ٣٢]

"আর তিনি আদমকে নামসমূহ সব শিক্ষা দিলেন তারপর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। সুতরাং বললেন, 'তোমরা আমাকে এগুলোর নাম জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। তারা বলল, 'আপনি পবিত্র মহান। আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(সূরা আল বাকারাহ্ : ৩১-৩২)

তাছাড়া লেখাপড়া বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান অর্জনের আদেশ দান করে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেনঃ

﴿ ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ٥ كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ ٦ ﴾]العلق :١، ٦[

"পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক থেকে। পড়, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।

(সূরা আল 'আলাক : ১-৫)

বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হলেন নবী ও রাসূলগণ। যুগে যুগে মানুষেরা তাঁদের মাধ্যমেই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেছে। নবী ও রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহ তাঁকে সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাঁর শিক্ষাদানের পাঠ্যসূচীও আল্লাহ পাকই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো, তাদেরকে পবিত্র করা এবং কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া। এ মর্মে কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়ে বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢ ﴾]الجمعة :٢[

"তিনিই উম্মীদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল।

(সূরা জুম'আ : ২)

লেখাপড়া, বিদ্যা-শিক্ষা ও জ্ঞানানুশীলনের জন্য কিতাব বা গ্রন্থ অপরিহার্য। তাই মহান আল্লাহ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেনঃ

﴿ الٓرۚ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ ١ ﴾ [ابراهيم :١]

এই কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আন, পরাক্রমশালী সর্বপ্রশংসিতের পথের দিকে।

(সূরা ইবরহীম : ১)

নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য লেখাপড়া করা, বিদ্যা শিক্ষা করা এবং জ্ঞান অন্বেষণ করা অপরিহার্য। কেননা এ ছাড়া মানুষের পূর্ণতা লাভের জন্য আর কোনো বিকল্প পথ নেই। সুতরাং এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশি তা আর ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। মহান আল্লাহ কালামে পাকে বলেছেন,

﴿ يُؤۡتِي ٱلۡحِكۡمَةَ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرٗا كَثِيرٗاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٦٩ ﴾ [البقرة :٢٦٩]

“তিনি যাকে চান প্রজ্ঞা দান করে। আর যাকে প্রজ্ঞা দেয়া হয়, তাকে অনেক কল্যাণ দেয়া হয়। আর বিবেক সম্পন্নগণই উপদেশ গ্রহণ করে।
(সুরা বাকারাহ্ : ২৬৯)

আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্যে। আর ইবাদতের সারবস্তু হলো আল্লাহর ভয়। যাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় আছে, তারাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইবাদত করে। আর যারা জ্ঞানী, কেবল তারাই আল্লাহকে ভয় করে থাকে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ ﴾]فاطر :٢٨[

“বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।

(সূরা ফাতির : ২৮)

মহান আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা দান করেছেন। আর সমগ্র মানবজাতির হেদায়াতের জন্য তিনি বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর কুরআন নাযিল করেছেন। নিঃসন্দেহে এটা বান্দার প্রতি তাঁর অপার করুণার নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছেঃ

﴿ عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَانَ ٢ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ ٣ عَلَّمَهُ ٱلۡبَيَانَ ٤ ﴾]الرحمن :٢، ٤[

“(পরম করুণাময়) তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনি তাকে শিখিয়েছেন ভাষা।"

(সূরা আর-রহমান : ২-৪)

যারা বিদ্যা শিক্ষা করে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে কেবল তারাই সৃষ্টি রাজ্যের রহস্য উপলব্ধি করতে পারে। তারা অনেক অজানা বস্তুকে জানতে পারে। আর যারা বিদ্যা শিক্ষা করে না, তারা এ থেকে চির বঞ্চিত। কাজেই বিদ্বান ও মূর্খ কখনও সমান হতে পারে না। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ

﴿ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ ٩ ﴾]الزمر[:

“বল, ‘যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?’”

(সূরাতুয্ যুমার : ৯)

যারা শিক্ষা অর্জন করে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়, তাদের সম্মুখে সৃষ্টি রাজ্যের রহস্যাবলীর দ্বার উম্মোচিত হয়। একমাত্র বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিরাই এর সন্ধান পেয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেছেনঃ

﴿ إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لَأٓيَٰتٖ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩٠ ﴾ [ال عمران : ١٩٠]

"নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য বহু নিদর্শন।"

(সূরা আলে ইমরান : ১৯০)

﴿ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦ خَلۡقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفُ أَلۡسِنَتِكُمۡ وَأَلۡوَٰنِكُمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّلۡعَٰلِمِينَ ٢٢ ﴾ [الروم :٢٢]

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য।"

(সূরা আর্-রূম : ২২)

﴿ فَتِلۡكَ بُيُوتُهُمۡ خَاوِيَةَۢ بِمَا ظَلَمُوٓاْۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٥٢ ﴾ [النمل :٥٢]

"সুতরাং ঐগুলো তাদের বাড়িঘর, যা তাদের যুলমের কারণে বিরান হয়ে আছে। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে সে কওমের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।"

(সূরা আন্-নামল : ৫২)

﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمۡسَ ضِيَآءٗ وَٱلۡقَمَرَ نُورٗا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلۡحِسَابَۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ يُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٥ ﴾ [يونس :٥]

“তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চাঁদকে আলোময় আর তার জন্য নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন মনযিল, যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা এবং (সময়ের) হিসাব। আল্লাহ এগুলো অবশ্যই যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছে্ন। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন।”

(সূরা ইউনুস : ৫)

মহান আল্লাহ উল্লেখিত আয়াতসমূহে বিদ্যা শিক্ষার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং অপরিহার্যতা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। জ্ঞান অন্বেষণের জন্য নানাভাবে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করার পর মানুষকে তিনি জ্ঞান লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করারও নির্দেশ দান করেছেন। তিনি বলেনঃ

﴿ وَقُل رَّبِّ زِدۡنِي عِلۡمٗا ١١٤ ﴾ [طه:١١٤]

“আর আপনি বলুন, ‘হে প্রভু! আপনি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।’”

(সূরা ত্বা হা : ১১৪)

কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করার পর অনেক শিক্ষার্থী গবেষণাকর্মে আত্মনিয়োগ করে। এ শ্রেণীর গবেষক শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١ ﴾ [الروم:٢١]

“আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য যারা চিন্তা করে।”

(সূরা আর্-রূম : ২১)

নারী শিক্ষা সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা:

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যেসব গুণের জন্য ইসলাম পৃথিবীর মানুষের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন হিসেবে পরিচিত, সমতা তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে।
ِاقرا باسم رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَق
 "পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আলাক্ব: ১)
এটিই ইসলামের প্রথম নির্দেশ, যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষা অর্জনের প্রাথমিক দলিল।
ইসলাম নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা অত্যন্ত জোরের সাথে ব্যক্ত করেছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗا ١٢٤ ﴾ [النساء: ١٢٤]

"পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎ কাজ করলে ও মুমিন হলে তারা জান্নাতে দাখিল হবে এবং তাদের প্রতি অনু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।"
(সূরা আন্-নিসা : ১২৪)
পরকালে জান্নাতের চির শান্তি লাভের উপায় হিসেবে দুনিয়াতে আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে দ্বীন। সুতরাং ইলমে দ্বীন জানা প্রত্যেক নর নারীর উপর একান্ত জরুরী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন।

﴿ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٩ ﴾ [الزمر: ٩]

"বল! যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।"

(সূরা আয্-যুমার : ৯)

জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান বিকাশের পৃষ্ঠপোষকতা মুসলিমদের জন্য অবশ্য করণীয় বা ফরয। নারী পুরুষ ভেদে ইসলামের শিক্ষা (জ্ঞান অর্জন) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘ইলম তলব করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর নারী) জন্য ফরয।’’ (ইবনু মাজাহ্, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ২২৪)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা নারী পুরুষ সকল বিশ্বাসীকে লক্ষ্য করে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তিনি শুধু জ্ঞানার্জনের তাকীদই দেননি, জ্ঞানার্জনের মর্যাদার বিষয়টিও আল্-কুরআনে একাধিকবার ব্যবহার করেছেন,

﴿ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ ﴾ [المجادلة :١١]

‘‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন।’’
(সূরা মুজাদালাহ্ : **১১**)

জ্ঞানের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসে আরও বর্ণিত আছে, ‘‘যে ব্যক্তি ইলম তলব করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করেছে আল্লাহ তা‘আলা তার দ্বারা তাকে বেহেশতের পথ সমূহের একটি পথে পৌঁছে দেন।’’

এ উক্তিটি ভেবে দেখার মত। কেননা জ্ঞানীদের কঠোর পরিশ্রম, সাধনা, ত্যাগ ও ধৈর্যের ফলে দ্বীনী জ্ঞান বিজ্ঞান সংরক্ষিত হয়ে অনাগত ভবিষ্যত বংশধরদের নিকট পৌঁছায়।

নর নারী উভয়েরই বিদ্যা শিক্ষার অধিকার অবশ্যই আছে। আত্মিক উৎকর্ষ সাধন যা মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য এবং এর সাথে সঙ্গতি রেখেই জাগতিক উন্নতি ও কল্যাণ অর্জনের জন্য সে বিদ্যা ও জ্ঞান আদি নর নারীকে দেওয়া হয়েছিল। তার ওপর ভিত্তি করে চিন্তা, গবেষণা ও অনুশীলনের দ্বারা উত্তম জ্ঞান বুদ্ধিকে উত্তম কাজে লাগানোর স্বত্বাধিকার উভয়েরই আছে। বিদ্যা ও জ্ঞান অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, এমনকি এটা ছাড়া মানুষ স্বীয় দ্বীনও সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। তাই উত্তম দ্বীনী বিদ্যা ও জ্ঞানের বিষয় যদি সুদূর কোনো দেশেও থাকে, তবে সেখানে গিয়ে হলেও তা অর্জন করার তাকীদ রয়েছে। আর দ্বীনের ইলম যারা হাসিল করেনি তাদের আমলও সঠিক হয় না।

মহিলাদের প্রাথমিক শিক্ষাগার ও প্রশিক্ষণ স্থান হলো গৃহ। তাই পিতামাতা যাতে কন্যাদেরকে এবং স্বামী যাতে স্ত্রীকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে শেখায় এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে, ইসলাম সেদিকে তাদের দৃষ্টি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছেঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا ﴾ [التحريم :٦] ﴿

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।”
(সূরা আত্-তাহরীম : ৬)
এ আয়াতের অর্থ আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এভাবে করেছেনঃ

علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم

“তোমরা নিজেরা শেখ এবং পরিবারবর্গকে শেখাও সমস্ত কল্যাণময় রীতি-নীতি এবং তাদের আদব শিক্ষা দাও এবং এসব কাজে অভ্যস্ত করে তোল।”

নবী-পত্নীদের মাধ্যমে নারী শিক্ষার গুরুত্ব:

وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا ।
"তোমাদের ঘরে যে আল্লাহর বাণী পাঠ করা হয় এবং হিকমত (সুন্নাহ/প্রজ্ঞা) পরিবেশন করা হয়, তা তোমরা স্মরণ কর এবং প্রচার কর।" (সূরা আহযাব: ৩৪)
এই আয়াত নারীদের দ্বীনি জ্ঞান অর্জন এবং তা প্রচারের দায়িত্ব নির্দেশ করে।

সৎকর্মে নারীর সমান অংশীদারিত্ব:
"আমি (আল্লাহ) তোমাদের কোনো সৎকর্মশীল ব্যক্তির-সে পুরুষ হোক বা নারী, কর্মফল নষ্ট করি না।" (সূরা আলে ইমরান: ১৯৫ ও সূরা নিসা: ১২৪)
উত্তম কাজের জন্য জ্ঞান অর্জন জরুরি, যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

ইসলামে শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য নেই। মহানবী (সা.)-এর যুগে নারীরা জ্ঞান অর্জনে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, এমনকি তারা আলাদা দিন নির্দিষ্ট করে শিক্ষার সুযোগ নিয়েছিলেন।

শিক্ষা সম্পর্কে হাদীসের নির্দেশনা:

শিক্ষা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনার পাশাপাশি হাদীসেরও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই নিজেকে একজন শিক্ষক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। এছাড়াও মহান আল্লাহ তাঁকে মানবজাতিকে কিতাব, হিকমত, উত্তম চরিত্র ইত্যাদি শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাঁর নবুয়তী জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে যেসব বাণী বিধৃত হয়েছে সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«طلب العلم فريضة على كلّ مسلمٍ»

‘‘জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলানের উপর ফরয বা অপরিহার্য।’’
(ইবনে মাজাহ্, সুনান, ১ম খণ্ড, কিবাতুল ইলম্)

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة»

‘‘যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, মহান আল্লাহ তাদ্বারা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।’’
(বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, ২য় খণ্ড)

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ ওহীযোগে আমাকে জানিয়েছেন-

"যে ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোনো পথ ধরে, আমি তার জন্য বেহেশতের পথ সুগম করে দেই।"
(বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, ৫ম খণ্ড)

কাসীর ইবনে কায়েস বলেন, আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ

«من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنّة»

"যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো পথ গ্রহণ করে, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের একটি পথে পরিচালিত করেন।"

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

"মহান আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তিনি তাকে দীনি গভীর 'ইলম দান করেন।"
(বুখারী, সহীহ্, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ইলম)

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع»

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, সে আল্লাহর পথেই চলতে থাকে, যতক্ষণ না ফিরে আসে।"
(তিরমিযী, জামিউত্-তিরমিযী)

আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

«إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»

"পূর্ণিমার রাতে নক্ষত্রমালার উপর পূর্ণ চন্দ্রের যেরূপব মর্যাদা, আবিদের উপর আলিমের মর্যাদা ঠিক তদ্রূপ।"

শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো দীন ইসলামকে সঞ্জীবিত রাখা, ইবাদতের নিয়ম-কানুন জানা এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ উদ্ধার করা, নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করা এবং অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করা বৈধ নয়।

কা'ব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ العُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ»

"যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করে যে, আলিমদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, অথবা বোকা ও মূর্খ লোকদের সাথে বিতর্ক করবে এবং লোকদের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।"
(তিরমিযী, জামিউত্ তিরমিযী, ২য় খণ্ড)

আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি বলে সাব্যস্ত হবে সেই আলিম, যার ইলমের দ্বারা কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না।"
(দারেমী, সুনান)

এছাড়াও জ্ঞানীদের সুউচ্চ মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الحِيتَانُ فِي المَاءِ، وَفَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ، كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ، إِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ»

‘‘জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, এমনকি পানির নিচের মাছ। অজ্ঞ ইবাদত গুজারের তুলনায় জ্ঞানী ব্যক্তি ঠিক সেরকম মর্যাদাবান, যেমন পূর্ণিমার রাতের চাঁদ তারকারাজির উপর দীপ্তিমান। আর জ্ঞানীগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।’’

(সুনান আত্-তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৮২)

অতএব, নারীদের শিক্ষা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। কেননা, নারী কখনো মা, কখনো বোন, কখনো ছাত্রী আবার কখনো পরিবারের কর্তী হিসেবে আবির্ভূত হন। তাছাড়া মা ই তার সন্তানের প্রথম শিক্ষক। সামগ্রিকভাবে সুশিক্ষিতা মা স্বভাবতই জ্ঞানী, চরিত্রবান, ব্যক্তিত্ব সম্পন্না, নিষ্ঠাবান, নম্র ও ভদ্র। শিক্ষিত মায়ের এসব গুণ আপনাআপনিই সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

নারীরা শুধু শিক্ষিত নয়, শিক্ষকও হতে পারেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা ছিলেন অন্যতম একজন শিক্ষক। এছাড়াও উম্মে সালমা, উম্মে হাবিবা, হাফসা, আসমা বিনতে আবু বকর, মায়মুনা, উম্মে হানী প্রমুখ মহিলা সাহাবিয়ার নাম প্রথম সারিতে এসে যায়।অতএব আল্-কুরআন ও সুন্নাহর এই অমোঘ নির্দেশের মধ্য দিয়ে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম নারী শিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। শিক্ষার অধিকার প্রদানের মাধ্যমেই ইসলাম নারীকে সুউচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। কারণ, বিশ্বাসী ও জ্ঞানীদের উচ্চাসন দেবেন বলে আল্লাহ্ নিজেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে নারী শিক্ষা:

শিক্ষা গ্রহণ সকল নরনারীর অবশ্যই কর্তব্য। ইসলামের প্রথম যুগে মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ে মেয়েরাও অধ্যয়ন করতেন। মসজিদে স্ত্রী পুরুষ একই সঙ্গে নামায পড়তেন। তখনও অবস্থাসম্পন্ন লোকেরা গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করে মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন। অথচ অজ্ঞতার যুগে নারীদের হেয় প্রতিপন্ন করা হত। তাই লেখাপড়া শেখানো ছিল কল্পনাতীত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী-পুরুষের জন্য শিক্ষা ফরয ঘোষণা করেন। তিনি পুরুষদের যেভাবে তালিম দিতেন মহিলাদেরও অনুরূপভাবে শিক্ষা দিতেন। তিনি বিভিন্ন হাদীসে জ্ঞান অন্বেষণে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি মহিলাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এ সময় তিনি কেবল তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন। ঈদের সময় দেখা যেত তিনি পুরুষদের সামনে ভাষণ শেষ করে নারীদের সমাবেশে চলে যেতেন এবং সেখানে বক্তব্য রাখতেন।

নারীদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য তিনি অভিভাবকদের বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। শুধু আযাদ মহিলাই নয় ঘরের দাসী বাদীদেরও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করেননি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَمَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَأَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله واثنتين؟ قَالَ: «واثنتين»

"যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোনকে লালন-পালন করবে এবং তাদেরকে ভদ্রতা, শিষ্টাচার, উত্তম চালচলন ও আচার ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে সাবলম্বী হতে সাহায্য করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কেউ যদি দুজনের জন্য এরূপ করে? তিনি বললেন, দু'জনের জন্য এরূপ করলেও হবে।"
(শারহুস সুন্নাহ, হাদীস নং ৩৪৫৭)

পুরুষদের শিক্ষার পাশাপাশি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী শিক্ষারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনে নারীদের নিকট বক্তৃতা করতেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। সম্ভ্রান্ত মহিলাদের তো কথাই নেই। এমনকি দাসীদেরকেও শিক্ষা দান করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে যে সমস্ত জ্ঞান চর্চার মজলিস অনুষ্ঠিত হতো মহিলারা অদূরে পর্দার অন্তরালে উপস্থিত থেকে তার উপকার লাভ করতেন। ইসলাম সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনই ছিল এসব মজলিসে তাদের উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশ্য। অনেক মহিলা ছিলেন, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে কুরআন পাঠ শুনেই তা মুখস্থ করে ফেলতেন। কোনো সময়ে যদি তিনি মনে করতেন যে, মহিলারা তার কথা ঠিকমত শুনতে পাননি, তা হলে তিনি পুনরাবৃত্তি করতেন।

আল্-কুরআনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষভাবে ঘরের মহিলাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষ সমাজকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামী সমাজের মহিলারা দ্বীন সম্পর্কে জরুরী জ্ঞান লাভ করুক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছিল বাসনা এবং চেষ্টা। কেবল নীতিগত জ্ঞান শিক্ষা দেয়াই লক্ষ্য ছিল না। সেই সঙ্গে বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষা দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ জন্য কেবল উপদেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। পিতামাতা বা স্বামী যদি পারিবারিক পরিবেশে জরুরী দীনি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করে, তা হলে ঘরের বাইরে গিয়েও সেই জ্ঞান লাভের সুযোগ মহিলাদের দিতে হবে, এই হচ্ছে ইসলামী আইনের বিধান। দীনি জ্ঞান লাভের জন্য নারীকে সুযোগ-সুবিধা দিতে গোটা সমাজই দায়িত্বশীল। এ পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা হলে তা দূর করতে হবে সমাজকেই। শুধু কিতাবী বিদ্যাই নারীদের জন্য যথেষ্ট নয়, তাদের চিন্তা-শক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে চিন্তা ও গবেষণার মাধমে নব-নব সত্য তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্য তাদের মানসিক শক্তির বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা করাও ইসলামী সমাজের কর্তব্য।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর জন্য শিক্ষাকে সীমিত করে দেননি। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেনঃ

﴿ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٧ ﴾ [ال عمران :٧]

"যারা জ্ঞানী ও বিদ্যান তারা বলেন, আমরা এর (কুরআন) প্রতি ঈমান এনেছি এবং কেবল বিবেক সম্পন্ন লোকেরাই (কোনো জিনিস থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।" (সূরা আলে ইমরান : ৭)

সুতরাং আল্-কুরআনকে বুঝবার জন্যও ইসলামের অনুসারীদের বিদ্যা ও জ্ঞানার্জন করতে হবে। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী পুরুষের ক্ষেত্রে পার্থক্য করেননি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী শিক্ষার উপর অসাধারণ গুরুত্বারোপ করেছেন।

মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদেরকে জ্ঞান চর্চার নির্দেশ দান করে বলেন,

﴿ وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ٣٤ ﴾ [الاحزاب :٣٤]

"আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে আয়াতসমূহ ও হিকতম পঠিত হয়- তা তোমরা স্মরণ রেখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।"
(সূরা আহযাব : ৩৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে নারী সমাজের মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার এমন অদম্য আকাঙ্খা ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল যে, সেজন্য তারা দিনরাত সবসময় ব্যতিব্যস্ত থাকতো। জ্ঞান আহরণের পথে কোনো বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে নিরাশ ও ভগ্নোৎসাহ করতে পারতো না। আনসারী মহিলাদের সম্পর্কে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেনঃ

نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعنهن الحياء ان يتفقهن في الدين

''আনসারী মহিলারা কতই না ভাল! দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে লজ্জা-শরম তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি।''
(মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, ১ম খণ্ড)

ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সে যুগের মহিলারা কত গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করতেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর নিম্নের উক্তি হতেই তা বোঝা যায়ঃ

''নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কুরআন মাজীদের কোনো আয়াত নাযিল হলে, আমরা তার শব্দগুলো হুবহু মুখস্থ না করলেও তার হালাল-হারাম এবং আদেশ-নিষেধগুলো স্মৃতিপটে গেঁথে নিতাম।''

ইবাদত এবং জ্ঞান চর্চার মজলিসে নারীরা বিশেষ উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতো। খাওলা বিনতে কায়েস আল্-জুহানিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুউচ্চ কণ্ঠের উল্লেখ করে বলেছেনঃ

كنت اسمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وأنا في موخر النساء.

''জুম'আর দিনে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুতবা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেতাম। অথচ আমি মেয়েদের সর্বশেষ কাতারে থাকতাম।''

হারিসা ইবনু নু'মানের এক কন্যা বর্ণনা করেছেনঃ

«ما حفظت "ق "إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم»

''আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে শুনেই সূরা কাফ মুখস্থ করেছিলাম। তিনি প্রত্যেক জুম'আর খুতবাতে এটি পড়তেন।''
(মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, ২য় খণ্ড)

মেয়েদের উপদেশ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। যদি কোনো সময় তিনি বুঝতে পারতেন যে, মেয়েরা তার বক্তব্য ঠিকমত শুনতে পায় নি, তাহলে তিনি তাদের কাছে গিয়ে পুনরায় তা বলে দিতেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এক ঈদের দিনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন,

«فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة»

''তিনি মনে করলেন যে, তাঁর কথা মেয়েদের কাছে পৌঁছাতে পারেন নি। তাই পুনরায় তিনি তাদেরকে নসীহত করলেন। তাদের সাদকা দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন।''
(বুখারী, সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ইলম)

ইসলাম জ্ঞানান্বেষণের জন্য নারীদের মনে অত্যন্ত গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। তাদের এই জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ ব্যবস্থা ছাড়াও মাঝে মধ্যে তাদের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ করে দিতেন। আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে,

''মহিলারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আপনার কাছে পুরুষরা এত ভিড় লাগিয়ে থাকে যে, অনেক সময় আমাদের পক্ষে আপনার কথা শুনা সম্ভবই হয় না। অতএব আমাদের জন্য আপনি আলাদা একটি দিন ধার্য করে দিন। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেই দিন তিনি তাদের কাছে গিয়ে উপদেশ দিতেন এবং সৎকাজের নির্দেশ দান করতেন।''
(বুখারী, সহীহুল বুখারী)

মালিক ইবনে হুয়াইরিস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমরা কয়েকজন যুবক দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলাম। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি, তখন তিনি বললেনঃ''তোমরা তোমাদের স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফিরে

যাও এবং তাদের কাছেই অবস্থান কর। তাদেরকে দীন সম্পর্কে শিক্ষা দাও এবং তা মেনে চলার নির্দেশ দাও।"
(বুখারী, সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল আযান)

সাহাবীদের যুগে নারী শিক্ষা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরবর্তীকালে সাহাবীগণ ব্যক্তিগতভাবে নারীদের চিন্তা ও কর্মের সংশোধনের জন্য ব্যাপক চেষ্টা-সাধনা করেছেন। একইভাবে তাঁরা সমাজ সংস্কারের যে চেষ্টা-সাধনা করতেন তাতেও পুরুষদের সাথে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত থাকত। আয়েযা নাম্নী এক মহিলা সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর বক্তৃতার উল্লেখ করে বলেছেন,

''আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে নারী ও পুরুষের উদ্দেশ্যে এই বলে নসীহত করতে দেখেছি যে, নারী পুরুষ নির্বিশেষে তোমাদের মধ্যে থেকে যেই ফিতনার যুগের মুখোমুখী হবে সে যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের কর্মপন্থা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে।'' (দারেমী, সুনান)

ফলে পূর্বে যে নারীরা জ্ঞান ও সংস্কৃতির সাথে একেবারেই অপরিচিত ছিল এখন তারা তার রক্ষক হয়ে দাঁড়ালো। চিন্তা ও সাহিত্যের জগতে যাদের কোনো অস্তিত্বই অনুভূত হতো না, এখন তারা জ্ঞান ও হিদায়াতের প্রদীপরূপে আত্মপ্রকাশ করলো।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর ছাত্র উরওয়া ইবন্ যুবায়র রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন,

''আমি কুরআন, ইসলামের ফরযসমূহ, হালাল ও হারাম, কাব্য ও সাহিত্য, আরবদের ইতিহাস ও নসবনামা বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী লোক আর দেখি নি। ।

আরবী কাব্য ও কবিতায় উরওয়া ইবন্ যুবায়র রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর বেশ দখল ছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রশংসা করা হলে তিনি বলতেন, কাব্য বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা -এর জ্ঞানের সাথে আমার জ্ঞানের কোনো তুলনাই চলে না। তিনি তো কথায় কথায় কবিতা থেকে প্রমাণ পেশ করতেন।

মূসা ইবন্ তালহা বলেনঃ

“আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর চেয়ে অধিক বাগ্মী ও শুদ্ধভাষী আর কাউকে দেখি নি।”

লোকেরা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর কাব্য ও সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞানের তুলনায় চিকিৎসা বিষয়ক অধিক জ্ঞান দেখে বিস্মিত হতো। ইবনে আবী মূলায়কা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-কে বললেন, আমরা আপনার কবিত্ব ও বাগ্মীতা দেখে চমৎকৃত হই না। কারণ আপনি আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর কন্যা। আর আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর বাগ্মীতা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু আপনি চিকিৎসা বিদ্যা কিভাবে শিখেছেন? আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বললেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লে বাইরে থেকে আগত প্রতিনিধিদল তাঁর চিকিৎসা করতো। আমি সেগুলো মনে রাখতাম।

ফারায়েযের অংক শাস্ত্রে তিনি এমন জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন যে, বড় বড় সাহাবীগণ পর্যন্ত উত্তরাধিকার বিষয়ক মাসআলা-মাসায়েল তাঁর নিকট থেকে জেনে নিতেন।

‘আমরাহ্ বিনতে আব্দুর রহমানও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর একজন ছাত্রী ছিলেন। ইবনে ইমাদ হাম্বলী নিম্নোক্ত ভাষায় তার কথা উল্লেখ করেছেনঃ

“আমরাহ্ বিনতে আব্দির রহমান আনসারী বিজ্ঞ ফিকহবিদ ছিলেন। তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর কোলে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। অতএব, তাঁর নিকট থেকে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য এবং মজবুত

স্মৃতিশক্তি ও ধারণ ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ সর্বদা গৃহীত হতো।

ইবন্ হিব্বান (র.) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেনঃ''তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন।''

তার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২২১০টি। আবু মুসা আশআরি (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবিদের কাছে কোনো হাদিস বোঝা কষ্টসাধ্য হলে আয়েশা (রা.)-কে প্রশ্ন করে সেই বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করেছি। (তিরমিজি)

উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালমা (রা.) ৩৭৮টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাফসা (রা.), সাফিয়া (রা.), উম্মে হাবিবা (রা.), ফাতিমা (রা.), জুওয়াইরিয়া (রা.), আসমা বিনতে আবু বকর (রা.), উম্মে আতিয়া (রা.), ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.), উম্মে হানী (রা.), আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা)-সহ প্রমুখ নারী সাহাবি রাসুল (সা.) থেকে বহুসংখ্যক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ফিকহ শাস্ত্রে নারী সাহাবিদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। আয়েশা (রা.) কর্তৃক এত অধিক ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে, যা একত্রিত করলে এক বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে যেতে পারে। অনুরূপ উম্মে সালমা (রা) কর্তৃক বর্ণিত ফাতোয়াগুলো একটি পুস্তিকার আকার ধারণ করতে পারে। ফতোয়া প্রদানকারী নারী সাহাবিদের মধ্যে হাফসা (রা.), উম্মে হাবিবা (রা.), উম্মে আতিয়া (রা.), সাফিয়া (রা), লায়লা বিনতে কায়েস (রা.), উম্মে দারদা (রা.), জয়নব বিনতে উম্মে সালামা (রা.), আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ফারায়েজ (মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ সম্পর্কিত বণ্টননীতি) বিষয়ে আয়েশা (রা.)-সহ অন্যান্য নারী সাহাবিরাও পারদর্শী ছিলেন। জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকেই নারী সাহাবিদের শরণাপন্ন হতেন। এসব মহীয়সী নারীরা তাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার দ্বারা মুসলিম উম্মাহকে সব সমস্যার সমাধান দিয়ে সাহায্য করেছেন।

অনেক নারী সাহাবি কোরআনুল কারিমের দরস দিতেন। রাবিতা বিনতে হায়্যান, উম্মে ইমাম বিনতে হারিসা, হিন্দ বিনতে উবায়েদ, উম্মে সাদ ইবনে রবি (রা.) প্রমুখ মহিলা সাহাবি পবিত্র কোরানের বেশিরভাগ আয়াতের হাফেজা ছিলেন।

আরবি সাহিত্যে নারী সাহাবিদের অতুলনীয় অবদান রয়েছে। খানসা বিনতে আমর ইবনুশ শারিদ (রা.) একজন বিখ্যাত সাহাবি ও কবি ছিলেন। আরবি সাহিত্যে নারী কবিদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন। তার ভাই সাখর ইবনে আমর ও মুয়াবিয়া ইবনে আমরের মৃত্যুতে শোকগাথা কবিতা রচনা করে আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ইসলাম নিয়ে যেসব জাহেলি কবি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করত, তিনি কবিতা দিয়েই সেগুলোর জবাব দিতেন। এ ছাড়া আয়েশা (রা) কবিতা রচনা করতেন। তিনি বহু কবিতা কণ্ঠস্থ করেছিলেন এবং কবিতা আবৃত্তিও করতেন। তিনি একজন বিদুষী কবি ছিলেন। অন্যদের মধ্যে সাওদা, উমামা, হিন্দ বিনতে হারিস, উম্মে আয়মান, মায়মুনা, রুকাইয়া, আতিকা বিনতে যায়েদ, কসবা বিনতে রাফে, বালাবিয়া (রা.) প্রমুখ নারী সাহাবি কবিতায় অতিশয় খ্যাতি লাভ করেন।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিভাবান নারী সাহাবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.)-এর শাসনামলে তারা কখনো কখনো আয়েশা (রা.)-এর সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তার সিদ্ধান্তকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিতেন। শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা.)-এর সিদ্ধান্তকে ওমর (রা.) অনুমোদন করতেন। অনেক নারী সাহাবি চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে তারা মুসলিম সৈন্যদের সেবায় নিয়োজিত হতেন।

রুফাইদা বিনতে সা'আদ ইসলামের ইতিহাসের প্রথম নারী নার্স, সার্জন এবং চিকিৎসাবিদ্যা ও নার্সিং প্রশিক্ষক। বাবা সা'আদ আল-আসলামির কাছ থেকে চিকিৎসাবিদ্যা শিখে তিনি খন্দক ও খায়বার যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবা দেন এবং মদিনায় প্রথম নার্সিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।খন্দক ও খায়বারের মত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে তিনি আহত সৈনিকদের চিকিৎসার জন্য স্বেচ্ছাসেবক নারী নার্সদের একটি দল নিয়ে প্রথম ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিখ্যাত মহিলা সাহাবী ও স্ত্রী আয়েশা সহ অন্যান্য মহিলাদের নার্স হতে এবং স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে কাজ করার প্রশিক্ষণ দিতেন।

তিনি একজন সমাজকর্মী হিসাবেও কাজ করেন এবং রোগের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধানে সহায়তা করতেন।

নুসাইবা বিনতে আল-হারিস সাতটি সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন, যেখানে তিনি পুরুষ যোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা (নার্সিং) প্রদান করতেন। তিনি একজন প্রবীণ আলেম ও ফকীহ ছিলেন। তিনি প্রায় ৪০টির মতো হাদিস বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। তিনি নারীদের মৃতদেহ গোসল (দাফন-কাফন) দেওয়ার পদ্ধতি সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করেছিলেন।

আশ-শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ একজন মেধাবী নারীর নাম যিনি ছিলেন তার অসাধারণ জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার কারণে বিশেষ সম্মানিতা। তার সময়ের খুব অল্প সংখ্যক নারীই লিখতে ও পড়তে শিখেছিল। তখন আরব অঞ্চলের বেশীরভাগ মানুষই ছিল অক্ষরজ্ঞানহীন, আর এটাই ছিল সেই সময়ের স্বাভাবিক দৃশ্য। প্রাক-ইসলাম যুগে নারীদের অবস্থান ছিল অনেক নীচে, শিক্ষা অর্জন করা ছিল নারীদের জন্য এক ধরনের বিলাসিতা যার সামর্থ্য খুব কম নারীরই হতো। এরই মাঝে আশ-শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ (রাঃ) এই গুণ অর্জন করেছিলেন এবং অন্যদের মাঝেও তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি স্বয়ং রাসূল (সাঃ)অনুরোধ করেছিলেন যেন তাঁর বিবি হাফসা বিনতে উমার (রাঃ) কে তিনি লিখতে পড়তে শিখিয়ে দেন। তিনি তাই করেছিলেন।

আশ-শিফা চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ শাখায়ও পারদর্শিনী ছিলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না সে সময় চিকিৎসা বিজ্ঞানে এখনকার মতো উৎকর্ষ সাধিত হয়নি। কাজেই সে সময় পর্যন্ত এ শাখায় যতটুকু জ্ঞান অর্জিত হয়েছিল আশ-শিফা তাতে দক্ষ ছিলেন। রাসূল (সাঃ) তাই বলেছিলেন যেন তিনি হাফসা (রাঃ) কে বিশেষ ধরনের চর্মরোগের চিকিৎসা পদ্ধতিও শিখিয়ে দেন। ধারণা করা হয়, হয়তো সেটি একজিমা জাতীয় রোগের চিকিৎসা সম্পর্কিত ছিল। বাজার নিয়ন্ত্রক হিসেবে আশ-শিফার নিয়োগ খুবই সফল হয়েছিল।

উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা বিনতে উমর (রাঃ) ছিলেন ইসলামের প্রাথমিক যুগের অন্যতম বিদুষী নারী, যিনি জ্ঞান, লিখনী ও ধর্মীয় পাণ্ডিত্যে অনন্য ছিলেন। তৎকালীন

আরবে যখন নারীদের শিক্ষা অপ্রচলিত ছিল, তখন তিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন, যা তাঁকে অনন্য করে তুলেছিল।তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন, পবিত্র কুরআন ও হাদীস সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং প্রথম খলিফা আবু বকরের (রাঃ) সময়ে সংকলিত কুরআনের মূল অনুলিপি তাঁর কাছে সংরক্ষিত ছিল।

উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা বিনতে আল-হারিস (রাঃ) ছিলেন ইসলামের অন্যতম বিদুষী ও জ্ঞানপিপাসু নারী, যিনি নবী করীম (সা.)-এর সান্নিধ্যে থেকে দীনি শিক্ষা অর্জন করেন । তিনি ৪৬টি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যা রাসুল (সা.)-এর ইবাদত, অযু, গোসল এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করে। তাঁর ভাতিজা ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

ইসলামের ইতিহাসে প্রখ্যাত কয়েকজন নারী যোদ্ধা হলেন উম্মে উমারা নুসাইবা বিনতে কা'ব (রা.), যিনি উহুদের যুদ্ধে রাসূল (সা.)-কে রক্ষা করেছিলেন । তিনি তরবারি ও ধনুক চালনায় পরদর্শী ছিলেন। এছাড়াও খাওলা বিনতে আল-আজওয়ার , আসমা বিনতে ইয়াযিদ, উম্মু সুলাইম , এবং প্রথম নৌ-যোদ্ধা উম্মু হারাম বিনতে মিলহান (রা.)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সাহসিকতার সাথে যুদ্ধের ময়দানে অংশ নিয়েছিলেন।

তাবেয়ীদের যুগে নারী শিক্ষা:

তাবেয়ীদের যুগে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ কাসিম ইবনু মুহাম্মদ (র.) ইমাম যুহরীকে বললেনঃ আমি তোমার মধ্যে জ্ঞান পিপাসা লক্ষ্য করছি। আমি কি তোমাকে জ্ঞানে পরিপূর্ণ একটি পাত্র দেখিয়ে দেব না? যুহরী বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, ‘আমরাহ্ বিনতে আব্দুর রহমানের মজলিস কখনো ছেড়ে থেকো না। কারণ, তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর কোলে লালিত-পালিত। অতএব, তিনি তাঁর জ্ঞানের পূর্ণ উত্তরাধিকারিণী। ইমাম যুহরী (র.) বললেন, তাঁর পরামর্শ অনুসারে আমি ‘আমরাহ্ বিনতে আব্দুর রহমানের খিদমতে হাজির হলে জানতে পারলাম, প্রকৃতই তিনি জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সম্পর্কে লিখেছেনঃ

"উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা পরিপক্ক বুদ্ধি ও সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারিণী ছিলেন।"

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর কন্যা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সম্পর্কে ইবনু আব্দিল বার (র.) বলেনঃ

"তিনি তাঁর যুগের সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহদের অন্যতম ছিলেন।"

আবূ রাফে' সায়িগ (র.) বলেনঃ

كنت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة ذكرت زينب بنت أبي سلمة.

"যখনই আমি ফিকহ্ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মদীনার কোনো মহিলার কথা স্মরণ করি, তখনই যায়নাব বিনতে আবূ সালামার কথা মনে পড়ে যায়।"

উম্মুল হাসান নামে উম্মে সালামার একজন দাসী ছিলেন। তিনি এতই যোগ্যতার অধিকারিণী ছিলেন যে, মেয়েদের মধ্যে নিয়মিত দ্বীনের প্রচার ও ওয়াজ নসীহত করতেন।"

উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সম্পর্কে ইমাম নববী (র.) বলেন:

كانت عاقلة من عقلاء النساء

"তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানবতী ও বুদ্ধি বিবেচনার অধিকারিণী মহিলাদের একজন।"

আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর স্ত্রী উম্মুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর জ্ঞান ও মর্যাদা এত উচ্চ পর্যায়ের ছিল যে, ইমাম বুখারী (র.) তাঁর আমলকে সহীহ্ বুখারী গ্রন্থে প্রমাণ ও উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন:

كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة

“উম্মুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা একজন ফকীহ্ মহিলা ছিলেন। তিনি নামাযে পুরুষের মত করে বসতেন। তাঁর এই আমল দলীল হিসেবে গণ্য।”
(বুখারী, সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল আযান)

“তিনি বিবেক-বুদ্ধি, মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার অধিকারিণী মহিলাদের মধ্যে গণ্য হতেন। এছাড়া তিনি ছিলেন ইবাদতগুজার এবং মুত্তাকী।”

“তাঁর জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধিমত্তা ও মর্যাদা সম্পর্কে সবাই একমত।”

ফাতিমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। একটি ফিকহী মাসআলার ব্যাপারে তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত উমর এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর সাথে বিতর্ক চালিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন নি। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহ অনেক বড় বড় ইমাম তাঁর সিদ্ধান্তকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম নববী (র.) লিখেছেন,

كانت من المهاجرات الأول ذات عقل وافر وكمال.

“তিনি প্রথম যুগে হিজরতকারিণীদের একজন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও পূর্ণতার অধিকারিণী ছিলেন।”

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর মা উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন মহিলা সাহাবী। হাফিয ইবনে হাজার (র.) তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন,

‘‘তাঁর মর্যাদা এবং গুণাবলী অনেক এবং সর্বজনবিদিত।’’

তাঁর সম্পর্কে ইমাম নববী (র.) বলেন:

كانت من فاضلات الصحابيات .

‘‘তিনি ছিলেন জ্ঞান ও মর্যাদার অধিকারিণী মহিলা সাহাবীদের একজন।’’

উম্মে আতিয়্যাহ্ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন মহিলা সাহাবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম নববী (র.) লিখেছেন:

وهي من فاضلات الصحابيات والغازيات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

‘‘তিনি উচ্চ মর্যাদা ও জ্ঞানের অধিকারিণী মহিলা সাহাবীদের একজন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জিহাদেও শরীক হয়েছেন।''

হাফসা বিনতে সিরীন উম্মে আতিয়্যা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর একজন ছাত্রী ছিলেন। বার বছর বয়সেই তিনি কুরআন মাজীদ শিক্ষা করেন। তিনি বসরার বাসিন্দা ছিলেন। বসরার বিখ্যাত কাযী ও ফকীহ্ ইয়াস ইবনু মু‘আবিয়া তাঁর সম্পর্কে বলেন,

ما أدركت أحدا أفضِّلُ على حفصة.

‘‘আমি এমন কোনো লোক দেখি নি, যাকে হাফসা বিনতে সিরীনের উপর মর্যাদা দিতে পারি।’’

তাবিয়ীদের ইমাম সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব তাঁর এক ছাত্রের সাথে নিজের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের পরদিনই তিনি তার উস্তাদ ইমাম সাঈদের মজলিসে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন তাঁর স্ত্রী ইমাম সাঈদের কন্যা বললেন:

اجلس أعلمك علم سعيد.

"আপনি বসুন। ইমাম সাঈদ আপনাকে যা শেখাবেন তা আমি আপনাকে শিখিয়ে দিব।"

ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট তাঁর ছাত্ররা মুয়াত্তা অধ্যয়নকালে কোথাও কোনো ভুল করে ফেললে ইমাম সাহেবের কন্যা ঘরের ভেতর থেকে দরজায় করাঘাত করতেন। নিজের কন্যা সম্পর্কে ইমাম মালিক (র.)-এর এতটা আস্থা ছিল যে, দরজায় তাঁর করাঘাত শুনলেই তিনি ছাত্রদের বলতেন:

ارجع فالغلط معك.

"তুমি আবার পড়। তোমার কোথাও ভুল হয়েছে।"

একবার আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একটি মাসআলা বর্ণনা করলেন। তখন উম্মে ইয়া'কুব নাম্নী বানী আসাদ গোত্রের এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বললেনঃ"আমি পূর্ণ কুরআন পড়েছি। কিন্তু আপনি যে মাসআলা বর্ণনা করলেন তা কোথাও পাইনি।"
(মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, ৩য় খণ্ড)

উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে নারী শিক্ষা:

উমাইয়া যুগে নারী শিক্ষার প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি প্রদান করা হতো। মুসায়েব এর স্ত্রী আয়েশা বিনতে সালেহ জোতির্বিদ্যা ও আরবের ইতিহাস সম্পর্কে এতখানি জ্ঞান লাভ করেন যে, একবার হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক তার জ্ঞানের গভীরতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে এক লাখ দিরহাম পুরস্কার দিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী সাবিনা বিনতে হুসাইন কবিতা ও সাহিত্যের এক উঁচু দরের সমালোচক ছিলেন যে, ফারাযদাকের মত কবিও তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। আব্দুল আযীয ইবনে মারওয়ানের কন্যা এবং ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের জ্ঞান প্রীতির কারণে তাঁদের বাড়িতে জ্ঞানী গুনী, কবি, সাহিত্যিক এবং ফকীহের আনাগোণা লেগেই থাকতো। আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে নারীগণ সমাজে পুরুষের ন্যায় স্বাধীনতা ভোগ করতেন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নারীদের প্রভূত প্রভাব ছিল। আবুল আব্বাস আস্ সাফফাহ এর স্ত্রী উম্মে সালমা, মাহদী মহিয়সী খায়জুরান, মাহদীর কন্যা উলাইয়া, হারুন-অর-রশীদের মহিয়সী জুবায়দা প্রমুখ নারী রাজকার্যে যথেষ্ট কর্তৃত্ব খাটাতেন। হারুনের মহিয়সী জুবায়দা উচ্চ গুণ সম্পন্না কবি ছিলেন। মামুনের মহিয়সী বুরান ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকা। আব্বাসীয় আমলে ছেলেমেয়েদের লালন-পালন ও শিক্ষা দানের দায়িত্ব জননীদের উপর ন্যস্ত ছিল। মহিলাগণ সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন।

জ্ঞানচর্চায় মুসলিম নারীদের অবদান - ১: জ্ঞান চর্চায় মহিলাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি কুরআন, হাদীস ইসলামী আইন প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। যে আট জন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তৃতীয়। অনেক বিশিষ্ট সাহাবী ও তাবিয়ী তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ‘আসমাউর রিজাল’ নামক গ্রন্থগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে এক হাজার সাহাবীর জীবন বৃত্তান্ত লেখা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৫০ জন মহিলা। এ থেকে অনুমান করা যায় তৎকালে নারী শিক্ষার উপর কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর মহিলার নিকট লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করতেন। বালাযুরী বলেন, আব্দুল্লাহর কন্যা আশ-শিফা ইসলামের পূর্বে লিখন পদ্ধতি শিখেছিলেন। তিনি আরও বলেন, ইসলামের প্রাথমিককালে মক্কায় যে ১৭ জন লেখাপড়া জানতেন, তাদের মধ্যে ৫ জন মহিলা ছিলেন। তিনি শুধু নারীদের নয় পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, বড় বড় সাহাবী ও তাবিয়ী তাঁর নিকট হতে হাদীস, তাফসীর ও জরুরী মাসায়েল শিখতেন। হাদীসে এসেছে, “আবু মুসা বলেন, আমরা রাসূলের সাহাবীগণ যখনই কোনো সমস্যায় পতিত হয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে জিজ্ঞাসা করেছি তখনই তাঁর নিকট থেকে সেই বিষয়ে ইলম্ লাভ করেছি।”

অপর একজন আয়েশা যিনি সা‘দের কন্যা ছিলেন, তিনি তার পিতার নিকট লেখাপড়া শিখতেন।

মহিলাদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ লাভের সঠিক, উপযুক্ত ও উত্তম ক্ষেত্র হচ্ছে তাদের ঘর ও পারিবারিক পরিবেশ। এ কারণে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রথমত পিতা-মাতা ও স্বামীর ওপর অর্পণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একখানা নির্দেশের ভাষা এই- “তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের নিকট চলে যাও, তাদের সঙ্গে বসবাস কর, তাদের জ্ঞান শিক্ষা দাও এবং তদনুযায়ী আমল করার জন্য তাদেরকে আদেশ কর।”

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূণ্যশীলা স্ত্রীগণ সকলেই শিক্ষিত ছিলেন। মহিলা সাহাবীগণও শিক্ষিত ছিলেন। তাদেরই প্রজ্জ্বলিত শিক্ষার আলো সমস্ত মুসলিম জাহানের মহিলাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধানের পর তার অনুসারীগণ, ইসলামের খলিফাগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্রাটগণ মানুষের মাঝে ইসলামের মহাত্মা প্রচারকে সার্থক করে তোলেন। সমাজের উন্নতি ত্বরাণ্বিত করার মানসে নারীরা পুরুষদের সাথে তাদের কর্তব্য পালনে কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

পুরুষরা যেভাবে শিক্ষিত ও জ্ঞানী গুণী হয়ে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক হয়েছিলেন, যেভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করে চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদিতে নিবেদিত প্রাণ হয়ে গবেষণা করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা, তারকারাজীর তত্ত্ব ও তথ্যসহ অন্যান্য বিষয় আবিষ্কার করে তাদের মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন, তেমনই পুরুষের সঙ্গে নারীরাও শিক্ষিত হয়ে সাহিত্যি, সংস্কৃতি, ধর্মীয় শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের অনন্য অবদান রেখে গেছেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে আরব জাহানে ইসলামের অনেক প্রতিভাবতী মহিলার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, যা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ। তাদের মধ্যে উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা অন্যতম। প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও ফারুকে আযম উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তার সিদ্ধান্তকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিতেন। শিফা বিনতে আব্দিল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এর সিদ্ধান্তকে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু অনুমোদন করতেন। তিনি মহিলা বিষয়ক কোনো কোনো সরকারি কাজের দায়িত্ব শিফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে দিতেন।

কুরআনের তাফসীর বর্ণনা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনায়, হাদীসের ব্যাখ্যায় সারা বিশ্বে মুসলিম জননীগণ বিশেষতঃ উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সমস্ত মহিলা সাহাবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-দের তুলনায় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ২২১০ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন । আর ৩৭৮ খানা হাদীস উম্মূল মু'মিনীন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, উম্মে হানী এবং ফাতিমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফিকহ বিদ্যায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক এত অধিক ফাতওয়া রয়েছে, যা একত্রিত করলে বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে যেতে পারে।

অনুরূপ উম্মে সালমা কর্তৃক বর্ণিত ফাতওয়াসমূহও একখানা পুস্তিকার আকার পেতে পারে। ফারায়েয বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা ও অন্যান্য মহিলা সাহাবী হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, ফারায়েয, কিরাআত ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তারা অনেকে কুরআনের হাফিযা ছিলেন।

হিন্দ বিনতে উবায়েদ, উম্মে ইমাম বিনতে হারিসা, রাবিতা বিনতে হায়্যান, উম্মে সা‘দ ইবনে রবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা প্রমুখ মহিলা সাহাবী পবিত্র কুরআনের বেশিরভাগ আয়াতের হাফিযা ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্-কুরআনুল কারীম দারস দিতেন। সহীহ্ মুসলিমের শেষাংশে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা কর্তৃক তাফসীরের কতকাংশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, জুওয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে শুরাইক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, লায়লা বিনতে কায়েস, খাওলা বিনতে তবীব, উম্মে দারদা, আতিকা বিনতে যায়েদ, সাহল বিনতে সুহাইল, ফাতিমা বিনতে কায়েস, যায়নাব বিনতে আবু সলিমা, উম্মে আয়মান, উম্মে ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা প্রমুখ যথাক্রমে পূণ্যশীলা মুসলিম জননীগণ, খাতুনে জান্নাত এবং মহিলা সাহাবীগণও বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা একত্রিত করলে কয়েকখান সুবৃহৎ গ্রন্থ হতে পারে। মজলিসে বয়ান ও বক্তৃতায় আসমা বিনতে সাকান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা যশস্বী ছিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আসমা বিনতে উমায়েস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা অনন্য ছিলেন। তাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, উম্মে কুলসুম বিনতে উক্‌বা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, করীমা বিনতে আল্-মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা ভাল লেখাপড়া জানতেন এবং তারা গভীর জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন।

মুসলিম মহিলাগণ সাহিত্য চর্চায়ও অগ্রগামী হয়ে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। অবশ্য ইসলামী যুগ থেকে আরবের নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সাহিত্য সাধনায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল। সেখানে জাকজমকের সাথে কবিতার মজলিস বসতো। আবু

বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহা নিজে কবিদের আসরে প্রধান অতিথি হতেন অথবা সভাপতির আসন গ্রহণ করে আসরে কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তার সুযোগ্য কন্যা উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কবিতা রচনা করতেন। তিনি বহু কবিতা কণ্ঠস্থ করেছিলেন এবং কবিতা আবৃত্তি করতেন। অন্যদের মধ্যে খানসা, সওদা, সুফিয়া, আতিকা, উমামা, মুরদিয়া, হিন্দ বিনতে হারিস, যয়নাব বিনতে আওয়ান, আতিকা বিনতে যায়েদ, হিন্দ বিনতে আনাস, উম্মে আয়মান, করিলা, আবদারিয়া, কসবা বিনতে রাফে, মায়মূনা, বালাবিয়া, নেয়াম, রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা কবিতায় অতিশয় খ্যাতি লাভ করেন। খানসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এর মত প্রতিভাবান মহিলা কবি সে যুগে পৃথিবীর বুকে বিরল। তার কবিতা পুস্তকাকারে ছাপানো হয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বিদূষী কবি, ঐতিহাসিক ও একজন শক্তিশালী বক্তা ছিলেন। কেবলমাত্র তাঁর বহুমুখী প্রতিভা বিভিন্ন ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি ও বর্ণনা থেকে নিয়ে তাঁর জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মুসলিম নারী ও পুরুষগণ উভয়েই সাধারণ শিক্ষার পর অনেকেই কারিগরী বিদ্যার বিভিন্ন শিল্প কাজে ও বাণিজ্যে, সেলাইয়ের কাজে, দ্রব্যশিল্পে, চামড়া রং এর কাজে, পশু পালনে,এমনকি হিসাব কিতাবে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ঐ সময়ে প্রায় সকল আরব মহিলা সাধারণভাবে নিজ নিজ কাজে মহিলারা অভিজ্ঞ ছিলেন। মুসলিম জননী সওদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা তায়েফের চামড়া প্রস্তুত করার পদ্ধতি জানতেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হলে আরবের প্রায় সমস্ত তীব্ব বিদ্যার বিশেষজ্ঞরা তাঁর চিকিৎসার ব্যাপার যা আলোচনা করতেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা তাই মনে রাখতেন। এই সময়ে ইবনে বালদা লতা-পাতা দ্বারা বর্তমান যুগের কবিরাজ হেকিমদের মত রোগের চিকিৎসা জানতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সংশ্রবে থেকে মুসলিম জননী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বিভিন্ন রোগের ওষুধ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে পরবর্তীকালে তা মুসলিম মহিলাগণকে শিক্ষা দেন। মহিলাগণ যাঁরা ইলমে তীব্ব ও রোগী শুশ্রুষায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন, তাদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুজাহিদ সৈন্যদের সেবা-শুশ্রুষার কাজেও নিয়োগ করা হতো। সাহাবী উরওয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেছেন, ''আমি উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে অন্য কোনো মহিলাকে ইলমে তীব্ব ও অস্ত্রপচার বিদ্যার অতীব পারদর্শী হতে দেখিনি।

মহিলা সাহাবীগণ তাঁদের যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা, উপলব্ধি ও দূরদৃষ্টি বলেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি মুসলিম জাতিকে দিক নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়িম (র.) বলেছেনঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে সকল সাহাবীর ফতোয়া সংরক্ষিত আছে তাঁদের সংখ্যা একশত ত্রিশের কিছু বেশী হবে। এদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তাঁদের মধ্যে আবার সাতজনের ফতোয়ার সংখ্যা এত বেশী যে, আল্লামা ইবনে হাযমের মতে তাদের ফতোয়াগুলো পৃথকভাবে একত্র করলে প্রত্যেকেরই একটি করে বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। এই সাতজনের মধ্যে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর মত ব্যক্তির সাথে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাও অন্তর্ভুক্ত।

ফতোয়া দানকারী সাহাবীদের দ্বিতীয় সারিতে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর সাথে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর মত মহিলা সাহাবীও রয়েছেন।

ফতোয়া দানকারী তৃতীয় আরও একদল সাহাবী আছেন। তাঁদের ফতোয়ার সংখ্যা খুব কম। এসব সাহাবীদের মধ্যে হাসান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, আবূ যার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু প্রমুখের মত ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। এই দলের মধ্যে উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, লায়লা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, আসমা বিনতে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে শরীফ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, খাওলা বিনতে তাওরীত রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, মায়মূনা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, যায়নাব বিনতে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে আয়মান রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উম্মে ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, গামিদিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা সাহাবীগণও অন্তর্ভুক্ত আছেন।

জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য ছোট ও বড় নারী ও পুরুষ এবং কাছের ও দূরের সব রকমের লোকই মহিলা সাহাবীদের শরণাপন্ন হয়েছেন। মুসলিম উম্মাহ এসব মহীয়িসী নারীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে তাদের সামনে সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। নিজেদের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর কাছে কত লোক যে আসা-যাওয়া করতো আয়েশা বিনতে তালহার বর্ণনা থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন:

كان الناس يأتونها من كل مصر.

"প্রত্যেক শহর ও জনপদ থেকেই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর কাছে লোক আসতো।"

হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উমর, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর এবং আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর মত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী সাহাবীদের ইজতিহাদী রায়েরও সমালোচনা করে তাঁদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।

সাহাবীদের মধ্যে হাদীসের অনেক বড় বড় হাফিয ছিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-ও তাঁদের একজন। আবূ হুরায়রা, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর এবং আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছাড়া আর কোনো সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত অধিক নয়।

আবূ মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর মত পণ্ডিত ও ফিকহবিদ সাহাবীও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তাঁর নিজের এবং তাঁর মতই আরও অনেকের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেনঃ

ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائسة إلا وجدنا عندها منه علما.

“আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীরা কোনো হাদীস নিয়ে সমস্যায় পড়লে সে বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-কে জিজ্ঞাসা করতাম এবং তাঁর কাছ থেকে সে ব্যাপারে কোনো না কোনো জ্ঞান অবশ্যই লাভ করতাম।”

জ্ঞানচর্চায় মুসলিম নারীদের অবদান - ২: মদীনার বিখ্যাত ফকীহ্ উরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস কাসিম ইবনে মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সম্পর্কে ইমাম ইবনুল ইমাদ আলহাম্বলী লিখেছেন, “যাঁরা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করেছেন এরা দু’জনও তাদের শামিল। তারা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর মত ও সিদ্ধান্ত কখনো অগ্রাহ্য করতেন না, বরং তাঁর মতামত ও সিদ্ধান্তের মধ্যে থেকে মাসআলা উদ্ভাবন করতেন।”

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, “আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে অনেক কিছু স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর প্রায় পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। মানুষ তাঁর কাছে থেকে অনেক কিছু জানতে ও শুনতে পেরেছেন এবং অনেক হুকুম-আহকাম ও আদবের কথা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, শরীয়তের এক চতুর্থাংশ আহকাম তাঁর থেকেই বর্ণিত হয়েছে।”

হাফিয ইবনে হাজার (র.) অন্য এক স্থানে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে হাদীস বর্ণনাকারী অষ্টাশিজন লোকের নাম উল্লেখ করার পর লিখেছেন যে, এসব ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে আছেন আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, আবূ মূসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর মত রাজনীতিবিদ এবং আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর মত মুহাদ্দিস ও ফকীহ। এদের সাথে আরও রয়েছেন সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের মত খ্যাতনামা তাবি‘য়ী এবং আলকামা ইবনে কায়েসের মত নামজাদা ফকীহ। তাঁদের মধ্যে যেমন স্বাধীন মানুষ এবং ক্রীতদাস ছিলেন, তেমনি ছিলেন নারী ও পুরুষ।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর অসাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে ইমাম যুহরী বলেন, ''যদি সকল মানুষের জ্ঞান এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যান্য পত্নীগণের জ্ঞান একত্র করা হয়, তাহলে এককভাবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর জ্ঞান হবে তাদের সকলের জ্ঞানের তুলনায় অধিকতর প্রশস্ত ও ব্যাপক।''

ইমাম যুহরী (র.) অন্যত্র বলেছেন, ''আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বড় বড় সাহাবীগণও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন।''

প্রখ্যাত আলেম বদরুদ্দীন যারকাশী (র.) একখানা কিতাব রচনা করেছেন, যাতে একটি বিষয়ই সন্নিবেশিত হয়েছে এবং তা হলো, ''অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের মোকাবেলায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর ভিন্ন মতসমূহ।'' কিতাবের নাম দিয়েছেন- ''আল্-ইজাবাহ্ লিঈরাদি মাস্তদরাকাৎহু আয়িশা 'আলাস্ সাহাবাহ্''। তিনি এ কিতাবের ভূমিকায় বলেছেন, এ কিতাবটিতে আমি এমন সব কথা সংকলিত করেছি যে ব্যাপারে আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা অন্যদের তুলনায় ব্যতিক্রমী মত ব্যক্ত করেছেন বা বিরোধী মত পোষণ করেছেন অথবা সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট পদ্ধতি তাঁর জানা ছিল কিংবা নিশ্চিত জ্ঞান তিনি লাভ করেছিলেন। অথবা সে বিষয়ে তিনি সমকালীন আলিমগণের মতামত অগ্রাহ্য করেছেন, কিংবা তাঁর মতের দিকে সমসাময়িক আলিমগণের একটা বড় অংশ ফিরে এসেছেন। অথবা ফতোয়া প্রদান করে সে বিষয়টি তিনি মুক্ত করেছেন বা স্বীয় ধারণা অনুযায়ী শক্তিশালী মতের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করেছেন।

উমর ইবনু খাত্ত্বাব, আলী ইবনু আবূ তালিব, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম এবং এঁদের মত ২৩ জন শীর্ষস্থানীয় সাহাবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম-এর সাথে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বিভিন্ন বিষয়ে যে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, ইমাম যারকাশী এ কিতাবে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। এসব মতামতের সংখ্যা ঊনপঞ্চাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

'আল্-ইজাবাহ্' কিতাবের ব্যাখ্যাতে বিশিষ্ট আলিম সাঈদ আল্-আফগানী বলেছেন, ''আমি কয়েক বছর যাবত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর জীবন সংক্রান্ত গবেষণার

কাজে নিয়োজিত ছিলাম। আমি তাঁর মধ্যে এমন অলৌকিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়েছি যা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। বিশেষ করে তাঁর জ্ঞান ছিল সমুদ্রতুল্য। জ্ঞানের দিগন্তে তিনি ছিলেন সমুদ্রবক্ষে উদ্বেলিত ঢেউয়ের মত। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত তাঁর মধ্যে যে বিষয়ের জ্ঞানেরই সন্ধান করতে চান না কেন, চাই তা ফিকহ, হাদীস, তাফসীর, ইসলামী বিধান, সাহিত্য, কবিতা, ঘটনাপঞ্জী, বংশ তালিকা, গৌরবগাঁথা, চিকিৎসা বা ইতিহাস, যাই হোক না কেন, আপনি তাঁর মধ্যে সব বিষয়ের সমাবেশ দেখতে পাবেন। এ ব্যাপারটা আপনাকে দস্তুরমত হতবাক করে দেবে। আপনি আরও অবাক হবেন, যখন দেখবেন এসব বিষয়ে তাঁর পরিপক্কতা ও পরিপূর্ণতা এমন সময়ে হয়েছিল যখন তাঁর বয়স আঠার বছর অতিক্রম করে নি।”

উম্মূল মু‘মিনীন সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর জ্ঞান ভাণ্ডার হতে মুসলিম উম্মাহ্ কি পরিমাণ লাভবান হয়েছে তা মুহায়রা বিনতে হুদায়রের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, হজ্জ আদায় করার পর আমরা কয়েকজন মহিলা মদীনায় গিয়ে সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর খিদমতে হাযির হলাম। সেখানে পৌঁছে আমরা দেখতে পেলাম যে, কূফার কিছুসংখ্যক মহিলা পূর্বেই তাঁর খিদমতে বসে আছে। আমরা তাঁকে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় এবং হায়েয ও নাবীযের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। এভাবে কত জায়গায় কত মানুষ যে তাঁর নিকট হতে শত শত মাসআলা জেনে নিয়েছে তার সীমা সংখ্যা নেই।

উম্মূল মুমেনীন উম্মে সালামার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এরূপ বত্রিশজন রাবীর নাম বর্ণনা করার পর হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেনঃ এ ছাড়া আরও অনেক লোক তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এসব বর্ণনাকারীদের মধ্যে বিখ্যাত সাহাবী ও তাবি‘ঈ উভয় শ্রেণীর লোকই রয়েছেন।

মারওয়ানের একটি জরুরী বিষয় জানা প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি বলেনঃ

كيف نسأل أحدا وفينا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

‘‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র পত্মীগণ আমাদের মাঝে বর্তমান থাকতে আমরা কোনো বিষয় সম্পর্কে অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করতে যাব কেমন করে? তাই তিনি লোক মারফত উম্মে সালামাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন। তিনি তার সে সমস্যার সামাধান করে দেন।

সাহাবীগণের ‘ইলমী মতপার্থক্য দূরীকরণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র স্ত্রীগণ বিরাট ও ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন। ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (র.) বলেনঃ

‘‘সাহাবীগণের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য হলে এবং উম্মুল মু‘মিনীনদের কেউ সে বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করলে, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করতেন এবং নিজেদের সমস্ত মতপার্থক্য পরিত্যাগ করে তা আঁকড়ে ধরতেন।’’

রুবাই‘ বিনতে মু‘আওয়ায রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা সাহাবী ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে মাসআলা জানার জন্য আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমরও কখনো কখনো তাঁর নিকট হাযির হতেন। এ থেকেই তাঁর জ্ঞানের মর্তবা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। রুবাই‘ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একুশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে আয়েশা বিনতে মালিক, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রহমান, নাফে‘, উবাদ ইবনুল ওয়ালীদ, খালিদ ইবনে যাকওয়ান, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনে আকীল, আবূ উবায়দা ইবনে মুহাম্মদ এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম প্রমুখ রয়েছেন।

ফাতিমা বিনতে কায়েস একজন বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে চৌত্রিশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর হাদীসের রাবীদের মধ্যে কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, উরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রহমান-এর মত সাহাবীগণ রয়েছেন। এছাড়া সুলাইমান ইবন ইয়াসার এবং শা‘বীর মত উচ্চ মর্যাদার তাবি‘ঈগণও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে শামিল আছেন।

উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (র.) লিখেছেন,

“তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যার জানাযার গোসলে শরীক ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেছেন। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর বর্ণিত হাদীসই মূলভিত্তি। সাহাবা এবং বসরার তাবি‘য়ী আলিমগণ তাঁর নিকট থেকেই মৃতকে গোসল দেয়ার নিয়ম-কানূন শিখেছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর থেকে আনাস ইবনে মালিক, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন এবং হাফসা বিনতে সিরীন বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।”

সা‘আদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাসের কন্যা আয়েশা এর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম মালিক, আইয়ূব সাখতিয়ানী এবং হিকাম ইবনে উতায়বার মত ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণও রয়েছেন। ইমাম শাফে‘য়ী (র.) হাসান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর নাতনী সাইয়িদা নাফিসা (র.)-এর কাছে গিয়ে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।

হাদীসচর্চায় মহিলা শিক্ষাবিদদের অবদান:

ইসলামের শুরু থেকে পরবর্তীতে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত নারীদের দ্বারা হাদীস সংরক্ষণ, হাদীস চর্চা, গবেষণা, শিক্ষাদান প্রভৃতি চলছে। মুসলিম ইতিহাসে সর্বদাই কিছু বিখ্যাত হাদীসবেত্তা নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। জীবন-চরিত সম্বন্ধীয় অভিধানে এরূপ অনেক মুসলিম নারীর সন্ধান পাওয়া যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়ে এবং পরে অনেক মহিলা সাহাবী বিশেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ হাদীস বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা, হাফসা, উম্মে হাবীবা, মায়মূনা এবং উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা প্রতিটি হাদীসের ছাত্র-ছাত্রীর নিকট স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যধারী হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত।

তাবি‘য়ীদের যুগে ইবনু সিরীনের কন্যা হাফসা, উম্মে আবূ দারদা এবং ‘আমরাহ্ বিনতে আব্দির রহমান গুরুত্বপূর্ণ হাদীসবেত্তা হিসেবে পরিচিত। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা হতে বর্ণিত হাদীসের অন্যতম বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন ‘আমরাহ্ (র.)। তাঁর এক ছাত্র হচ্ছেন আবূ বকর ইবনে হাযম যিনি মদীনার প্রসিদ্ধ বিচারক ছিলেন, যিনি ‘আমরাহ্ এর বর্ণিত সকল হাদীস লিখে ফেলার জন্য তৎকালীন খলীফা উমর ইবন আব্দিল আযীয (র.) কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন।

এদের পরে ‘আবিদা, ‘আবদা ইবন বিশর, উম্মে ‘উমর, যয়নাব, নফিসা, খাদীজা, ‘আবদা বিনতে ‘আব্দুর রহমান এবং আরো অনেক নারী হাদীসের উপর বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং তাঁরা হাদীস শিক্ষা দিতেন। এসব নারীরা বিভিন্ন পরিবেশ থেকেই এসেছেন। যেমন আবিদা একজন দাসী ছিলেন এবং এ অবস্থায় থেকেই তিনি মদীনার শিক্ষকদের নিকট হাদীস চর্চা করেন। এটা বলা হয় যে, তিনি দশ সহস্রাধিক হাদীসকে তাঁর শিক্ষকদের সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস চর্চায় নারীরা পুরুষের সাথে অংশগ্রহণ করে হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। এ ব্যাপারে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, সকল গুরুত্বপূর্ণ হাদীস সংগ্রাহক অনেক নারী থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। প্রতিটি প্রধান সংগ্রহে অনেক নারীর নাম রয়েছে।

চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে আমরা ফাতিমা বিনতে আব্দির রহমান, ফাতিমা (আবূ দাউদের নাতনী), আমাত আল্-ওয়াহিদ (বিখ্যাত আইনবিদ আল্-মুহামিলির কন্যা), উম্মে আল্-ফাৎহ আমাত আস্-সালাম (বিচারক আবূ বকর আহমদের কন্যা), জুমু‘আ বিন্তে আহমদ ও আরো অনেক বিদূষীর পরিচয় পাই যাঁদের ক্লাসে সর্বদাই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রোতা উপস্থিত থাকত।

এ ধারা ৫ম ও ৬ষ্ঠ হিজরী সন পর্যন্ত চালু ছিল। ফাতিমা ইবন আল্-হাসান শুধু তার তাকওয়ার জন্যই পরিচিত ছিলেন না বরং হাদীস ও এর ইসনাদের গুণাগুণ বিচারে তাঁর জ্ঞানের প্রখরতার জন্যও পরিচিত ছিলেন। তার চেয়েও বেশি পরিচিত ছিলেন কারিমা আল্-মারওয়াযিয়্যা। তিনি ঐ সময়ে সহীহ্ আল্-বুখারীর সর্বোত্তম Authority

হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আল্-খতিব আল্-বাগদাদী ও আল্-হুমাইদী তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন।

শুহাদা একজন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার, অত্যন্ত সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য হাদীসবিদ ছিলেন। জীবনী লেখকগণ তাঁর পরিচয় দেন এভাবে- তিনি ক্যালিগ্রাফার ও বিখ্যাত হাদীসের বর্ণনাকারী এবং নারী জগতের জন্য গর্ব ছিলেন। তার পিতা আবূ নাসর স্বীয় কন্যাকে গভীরভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়েছেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদদের অধীনে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করেছিলেন। সহীহ্ আল্-বুখারী ও অন্যান্য হাদীস সংগ্রহ হতে তার বক্তৃতামালা শুনতে অনেক জ্ঞানপিপাসু জমায়েত হত; এমনকি কেউ কেউ তাঁর ছাত্র না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ছাত্র হবার মিথ্যা দাবী করত। সিইত আল্-ওজারা শুধু ইসলামী আইনের উপরই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেননি, তিনি ‘তাঁর সময়ের মুসনিদা’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। হিজাযের হাদীসের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত উম্মে আল্-খায়ের আমাত আল্-খালিক এভাবে বিভিন্ন ক্লাস পরিচালনা করতেন।

অন্যদিকে উম্মে আল্-খায়ের ফাতিমা এবং ফাতিমা আল্-শাহরাজুরিয়া সহীহ্ মুসলিম-এর উপর লেকচার দিতেন। ফাতিমা আল্-জাওযানিয়া তাবরানী থেকে তাঁর ছাত্রদের পড়াতেন। যয়নাব ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বলের ‘মুসনাদ' থেকে পড়াতেন। সেখানে অনেক ছাত্র আকৃষ্ট হয়ে তার বক্তৃতা শুনত। জুওয়াইরিয়া বিনতে উমর এবং যয়নাব বিনতে আহমদ ইবনে উমর, আদ্-দারেমী ও আবদ ইবনে হুমাইদ এর হাদীস সংকলন হতে বর্ণনা করতেন।

বিস্ময়ের কথা হচ্ছে, পরিব্রাজক ইব্নে বতুতা দামেশকে থাকার সময় যয়নাব বিনতে আহমদ ও অন্যান্য শিক্ষিকার নিকট হাদীসের বিদ্যা লাভ করেন। দামেশকের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আসাকির বলেন, তিনি ১২০ জন পুরুষ ও ৮০ জন নারীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। সুয়ূতী ইমাম শাফে‘য়ীর ‘রিসালাহ্’ গ্রন্থটি হাজার বিনতে মুহাম্মদের কাছে অধ্যয়ন করেন।

এ ছাড়াও যয়নাব বিনতে আল শা’রি একাধিক প্রসিদ্ধ হাদিসবেত্তা থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং পরে ছাত্রদেরকে এসব শিক্ষা দেন যাদের কেউ কেউ পরে খ্যাতি লাভ

করেন। যেমন সুপরিচিত জীবন চরিত সম্বন্ধীয় অভিধান ‘ওয়াফাত আল্-‘আ‘ইয়ান’ এর লেখক ইবনে খাল্লিকান তাঁর ছাত্র। আরেকজন হচ্ছেন কারিমা যাকে তাঁর সময়ে সিরিয়ার শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তা হিসেবে ধরা হয়। ইবনে হাজার তার ‘আল্-দুরার আল্-কামেনা’ গ্রন্থে ৮ম শতাব্দীর ১৭০ জন প্রখ্যাত নারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেন। যাঁদের অধিকাংশই হাদীসবিদ ছিলেন এবং যাঁদের অনেকের অধীনে তিনি নিজে পড়াশোনা করেছেন। এসব মহীয়সী নারীর কয়েকজন আবার ঐ সময়ের সবচেয়ে জ্ঞানী হাদীস বিশারদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ জুয়াইরিয়া বিনতে আহমদ-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যিনি পুরুষ ও নারী উভয় রকমের পণ্ডিতদের নিকট থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন এবং তিনি নিজেও ঐ সময়ের বড় বড় মাদরাসায় শিক্ষকতা করেছেন।

ইবনে হাজার (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমার নিজের কিছু শিক্ষক এবং সমসাময়িক অনেকেই তাঁর বক্তৃতামালা শুনতেন।’ আয়েশা বিনতে আবদ আল্-হাদী দীর্ঘদিন ইবনে হাজারের শিক্ষক ছিলেন। তাঁকে তাঁর সময়ের সর্বোচ্চ মানের হাদীসবিদ হিসেবে গণ্য করা হত এবং অনেক ছাত্রই দীর্ঘ পথ সফর করে তাঁর কাছে দ্বীনের সত্যজ্ঞান লাভ করতে ছুটে আসত।

নবম শতাব্দীতে হাদীসে নারী বিশেষজ্ঞদের সকল তথ্য পাওয়া যাবে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আল্-সাখাবী রচিত “আদ-দ্বাউ উল-লামে‘ ” গ্রন্থে। এছাড়াও আবদ আল্-আযীয ইবনে উমর তার ‘মু‘জাম আল-শুয়ূখ’ গ্রন্থটিতে ১৩০ জন নারী স্কলারহ ১১০০-এর বেশী লেখকের শিক্ষকদের নাম উল্লেখ করেছেন। এসব মহিলাদের কেউ কেউ হাদীসবিদ্যায় বেশ পাণ্ডিত্য অর্জন করে ঐ সময়ে প্রখ্যাত ছিলেন। তন্মধ্যে উম্মে হানী, মারিয়াম উল্লেখযোগ্য। যিনি তার শৈশবেই কুরআনের হাফেযা হয়ে যান এবং ইসলামের থিওলজি, আইন, ইতিহাস ও ব্যাকরণে বিশদ জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি হাদীস শাস্ত্রে গভীরতা লাভের প্রত্যাশায় কায়রো ও মক্কা শহরে গিয়ে ঐ সময়ের শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তাদের থেকে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি এতটাই দ্বীনদার ছিলেন যে, ন্যূনপক্ষে ১৩ বার হজ্জ সম্পাদন করেন। তিনি কায়রোর বিখ্যাত কলেজে ব্যাপক প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন। অনেক স্কলারকে ‘ইজাযত্’ (তাঁর পক্ষ থেকে হাদীস প্রচারের অনুমতি) প্রদান করেন।

তাঁর সমসাময়িক সিরিয়ার বাই খাতুন হাদীস শাস্ত্রে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার নিকট হতে ‘ইজাযত’ পেয়েছিলেন। তিনি নিজেও পরবর্তীতে এ বিষয়ে সিরিয়া ও কায়রোতে অনেক বক্তব্য রাখেন। আয়েশা ইবন ইবরাহীম ও মক্কার উম্মে আল্-খায়ের সাঈদা উভয়েই দামেশক, কায়রোসহ অন্যান্য শহরে জ্ঞানার্জনের জন্য গমন করেন এবং পরবর্তীতে তাঁরা বিভিন্ন শহরে সুনামের সাথে অন্যদেরকে শিক্ষা দেন।

গবেষণায় দেখা যায় যে, হিজরী দশম শতাব্দী হতে হাদীস শাস্ত্রে ও ইসলামের অন্যান্য বিষয়ে পাণ্ডিত্যলাভে নারীদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা ব্যাপকহারে কমে গেছে। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে মাত্র ডজন খানেক প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ নারীর নাম পাওয়া যায়। যাঁরা মূলত নবম শতাব্দীর শেষের দিকে আবির্ভূত হন। আসমা বিনতে কামাল আল্-দীন হাদীসের উপর লেকচার দিতেন। ঐ সময়ের সুলতানের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিষয়ে গ্রহণযোগ্য মতামত দিতেন এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে নারীদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন। প্রখ্যাত বিচারক মুসলেহ আল-দীনের স্ত্রী আয়েশা বিনতে মুহাম্মদ দামিস্কের সালিহিয়া কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। এলেপ্পোর ফাতিমা বিনতে ইউসুফ তাঁর সময়ের অন্যতম পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

ফাতিমা আল্-জুযাইলিয়া অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি মক্কায় অবস্থান করেন এবং সেখানে সমৃদ্ধ এক পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে তোলেন। পবিত্র মক্কা শহরে তিনি হাদীসের উপর লেকচার দিতেন এবং অনেকেই তাতে অংশগ্রহণ শেষে তাঁর নিকট হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতেন।

ইতিহাস ঘাটলে এটা পরিষ্কার হয় যে, মুসলিম নারীরা জ্ঞানার্জনে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হবার চেষ্টা চালিয়েছেন।ইবনে আল্-বুখারীর সার্টিফিকেট ফলিওতে দেখা যায়, ৫৮৭/১২৮৮ সনে দামিস্কের উমর মসজিদে অনুষ্ঠিত ১১ বক্তৃতার একটি নিয়মিত কোর্সে অনেক নারী উপস্থিত থাকতো। অন্যদিকে দামিস্ক (৮৩৭/১৩২২ সনে) পাঁচ লেকচারের একটি কোর্সে পঞ্চাশাধিক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, এ কোর্সটি পরিচালিত হত প্রখ্যাত মহিলা হাদীস বিশারদ উম্মে আব্দুল্লাহ কর্তৃক।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীর পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থায়ন:

ইসলামের শুরু থেকেই শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ও তাত্ত্বিক উন্নয়নে নারীরা অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান অর্জন নারী-পুরুষ সবার জন্য ফরজ। এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম নারীরা যুগে যুগে শুধু শিক্ষার্থী হিসেবেই নয়, বরং শিক্ষক, পৃষ্ঠপোষক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনন্য নজির স্থাপন করেছেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইতিহাসের পাতায় মুসলিম নারীদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে মরক্কোর ফেজ শহরে ফাতিমা আল-ফিহরি নামের এক বিদুষী নারী প্রতিষ্ঠা করেন আল-কারাউইন বিশ্ববিদ্যালয়। এটি গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অনুযায়ী পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু থাকা ডিগ্রি প্রদানকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে দামেস্ক ও কায়রোতে অনেক মাদ্রাসা নারীদের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আইয়ুবীয় ও মামলুক শাসনামলে রাজপরিবারের নারীরা বহু মাদ্রাসা, এতিমখানা এবং পাঠাগারের ভিত্তি স্থাপন করেন।

১২৪২ সালে হালাবের শাসক দায়ফা খাতুন দুটি বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—আল-ফিরদাওস স্কুল ও খানকাহ স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। এছাড়া সুলতানা হুররেম সুলতানের মতো ব্যক্তিত্ব উসমানীয় সাম্রাজ্যে মাদ্রাসা ও পাঠাগার নির্মাণে বিপুল অর্থায়ন করেছিলেন।

ইসলামে নারী শিক্ষা সম্পর্কে চার মাযহাব মতামত:

ইসলামে নারী শিক্ষা ফরজ বা আবশ্যিক, যা চার মাযহাবই একমত। নারীদের দ্বীনি জ্ঞান অর্জন (কুরআন, হাদীস, ফিকহ) অপরিহার্য, যাতে তারা শরীয়ত মেনে চলতে পারে। পর্দা রক্ষা এবং পর্দার বিধান মেনে (মাহরামের উপস্থিতিতে) শিক্ষা গ্রহণ, কুরআন-সুন্নাহ চর্চা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সাধারণ শিক্ষা অর্জনে কোনো বাধা নেই।
চার মাযহাবের মূল মতামত নিচে দেওয়া হলো:

হানাফী মাযহাব: নারীদের দ্বীনি জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য মনে করে। তবে তাদের ঘরের বাইরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে, বিশেষ করে পর্দা রক্ষা না হলে বা অমুসলিম পরিবেশে, বা মাহরাম ছাড়া সফর করার ক্ষেত্রে ফতোয়ায়ে শামী অনুযায়ী বিধিনিষেধ বা সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

শাফেয়ী মাযহাব: শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে (পর্দা ও মাহরামের বিধান মেনে) নারীদের শিক্ষা গ্রহণকে উৎসাহিত করে। নারীদের চিকিৎসার জন্য নারী চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা তারা গুরুত্বের সাথে দেখেছে।

হাম্বলী মাযহাব: নারীদের দ্বীনি শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত করে, তবে তা যেন পারিবারিক ও পর্দার বিধান লঙ্ঘন না করে।

মালেকী মাযহাব: নারীর জ্ঞান অর্জনকে প্রয়োজনীয় মনে করে, তবে পর্দার বিধান এবং শরীয়তের গণ্ডির ভেতর থাকা আবশ্যক বলে মত দিয়েছে।

নারী শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামী যৌক্তিকতা:

জ্ঞানার্জনের কোনো বিকল্প ইসলামে নেই। সুতরাং ইসলাম জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। ফলে ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হতে থাকে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে জ্ঞানচর্চার যে প্রবাহ শুরু হয়, নারীরাও সেখানে শামিল হয়েছিল। পরবর্তীতে আববাসীয় ও উমাইয়্যা যুগে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে উভয়কে সমভাবে জ্ঞানার্জনের আদেশ দিয়েছে। কুরআনের নির্দেশও তাই। কুরআন সকল পাঠককেই আদেশ করছে পড়তে, চিন্তা-গবেষণা করতে, অনুধাবন করতে, এমনকি বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে লুক্কায়িত বিভিন্ন নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে প্রথম যে ওহী নাযিল তার প্রথম শব্দ ছিল ‘ইকরা’ অর্থাৎ পাঠ কর। এখানে স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই পাঠ করতে বলা হয়েছে। সুতরাং জ্ঞানার্জন শুধুমাত্র পুরুষের জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়নি, পুরুষের মত নারীকেও জ্ঞানার্জনের পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জীবনব্যাপী জ্ঞানের সাধনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমাদের উচিত সর্বদা জ্ঞানার্জনে ব্রতী থাকা।

এমনকি তিনি ক্রীতদাসীদেরকেও শিক্ষার সুযোগ দেয়ার নির্দেশ দান করেছেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তৃতার আসরে যোগ দিতেন। বদর যুদ্ধে বন্দীদের শর্ত দেয়া হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে যে কেউ দশজন মুসলিমকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে তাদের প্রত্যেককেই বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেয়া হবে।

ইসলামে পার্থিব শিক্ষা লাভ করার জন্য নারীকে শুধু অনুমতিই দেয়া হয়নি; বরং পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা যেমন প্রয়োজন মনে করা হয়েছে, নারীদের শিক্ষা-দীক্ষাও তদ্রূপ মনে করা হয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এবং অন্যান্য উচ্চ শিক্ষিতা মহিলারা শুধু নারীদের নয়, পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। সাহাবী, তাবে'য়ী এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁদের নিকট হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। অতএব, শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে নি। উভয়ের অধিকার সমান।

ইসলামে ধর্মীয় ও পার্থিব শিক্ষা লাভ করার জন্য নারীকে শুধু অনুমতিই দেওয়া হয়নি; বরং পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা যেমন প্রয়োজন মনে করা হয়েছে, নারীদের শিক্ষা-দীক্ষাও তদ্রূপ প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে পুরুষগণ যেমন দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করত, নারীগণও তদ্রূপ করত। নারীদের জন্য সময় নির্ধারিত করা হত এবং সেই সময়ে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হতে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ, বিশেষ করে আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা শুধু নারীদের নয় পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাঁর নিকট হতে বড় বড় সাহাবী ও তাবে'য়ীগণ হাদীস তাফসীর ও ফিকহ্ শিক্ষা করতেন। সম্ভ্রান্ত লোকদের তো কথাই নেই, দাস-দাসীদের পর্যন্ত শিক্ষা দান করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন।

অতএব, মূল শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অবশ্য শিক্ষার প্রকারে পার্থক্য আবশ্যক। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রকৃত শিক্ষা এই যে, তদ্বারা তাকে আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা এবং আদর্শ গৃহিনীরূপে গড়ে তোলা হবে। যেহেতু তার কর্মক্ষেত্র গৃহ, সেহেতু তাকে এমন শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যা এ ক্ষেত্রে তাকে অধিকতর উপযোগী করে তুলতে পারে। এ ছাড়া তার জন্য ঐ সকল বিদ্যা-শিক্ষারও প্রয়োজন যা মানুষকে প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে তুলতে, তার চরিত্র গঠন

করতে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রশস্ত করতে পারে। এই ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা প্রত্যেক নারীর জন্য অপরিহার্য। এরপর কোনো নারী যদি অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মানসিক যোগ্যতার অধিকারিণী হয় এবং এ সকল মৌলিক শিক্ষা-দীক্ষার পরও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়, তাহলে ইসলাম তার পথে প্রতিবন্ধক হবে না। তবে শর্ত এই যে, কোনো অবস্থায়ই সে শরী'আতে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করবে না। শরী'আতের গণ্ডির মধ্যে থেকে তাকে উচ্চ শিক্ষালাভে ব্রতী হতে হবে।

ইসলাম যেভাবে পুরুষের উপর শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন ফরয করে দিয়েছে, ঠিক তেমনি এটা ফরয করে দিয়েছে নারীদের উপর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিমদের তাঁর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছেন। এ ঘোষণায় তিনি পুরুষ বা মহিলা কাউকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেননি। তিনি আরও বলেছেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপরই ফরয।"এখানেও নর ও নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে পুরুষ ও মহিলা উভয় সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গোটা মানব জাতিকে ধবংস হতে উদ্ধার করার লক্ষ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ বাণী সে যুগে এমন নজিরবিহীন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, যে যুগে পৃথিবীর কোথাও নারীর কোনো রকম ইয্যত-সম্মান ছিল না। তথাকথিত উন্নত জাতির লোকেরাও নারীদেরকে মানবের স্তর হতে বহিষ্কার করে জীব-জন্তুর স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। মহান আল্লাহ অশেষ রহমত করে তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষার মাধ্যমে শুধু পুরুষদেরকেই নয়, বরং নারীদেরকেও সঠিক মানবতা ও মর্যাদার উঁচু চূঁড়ায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। বর্বরতার যুগে ক্রীত দাস-দাসীদের মান-ইয্যত বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু ইসলামের শিক্ষার মাধ্যমে তারাও এত উচ্চ আসনে আসীন হয়েছেন যে, অনেক সম্মানিত ব্যক্তিরাও তাঁদের নিকট হতে দীনি শিক্ষা গ্রহণের মুখাপেক্ষী হয়েছেন।

ইসলামের শিক্ষার আলোকে পুরুষদের মধ্য হতে যেমনি আবূ বকর, উমার, উসমান, আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম এবং হাসান বসরী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী এর মত মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটেছিল, ঠিক তেমনি আয়েশা, হাফসা, শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ, কারীমা বিনতে মিকদাদ, উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুন্নার মত মহিয়সী

নারীও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মোটকথা, ইসলামের নির্ধারিত সীমা ও গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করেই সে যুগের মহিলাগণ আত্মসংশোধন এবং জাতির খিদমতের উদ্দেশ্যে দীনি-শিক্ষা লাভ করতেন এবং নিজ সন্তানদেরকে এমন আদর্শবান করে গড়ে তুলতেন, যাতে তাঁরা নিজেদের যুগের পথিকৃৎ রূপে কওমের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন।

শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করার জন্য নারী জাতিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদীসে তাকীদ দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষাকে যেরূপ জরুরী মনে করা হয়েছে, মহিলাদের জন্যও তেমনি আবশ্যক মনে করা হয়েছে। পুরুষরা যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তা‘লীম গ্রহণ করতেন, তেমনি করতেন নারীরাও। শুধু সম্ভ্রান্ত মহিলাদেরকেই নয়, বরং দাসীদেরকেও শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘যার নিকট কোনো দাসী আছে এবং সে তাকে শিক্ষা দান করে, ভালভাবে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয়, এবং মর্যাদা দান করে, তার জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।''

পুরুষ সাহাবীগণ যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতেন, তেমনি মহিলা সাহাবীগণও নিঃসংকোচে জ্ঞান অর্জন করতেন। সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যেমন পুরুষ মুফতী ছিলেন, তেমনি ছিলেন মহিলা মুফতী। উমর, আলী, যায়েদ ইবন সাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম প্রমুখ পুরুষ সাহাবীদের ন্যায় আয়েশা সিদ্দীকা, উম্মে সালমা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুন্না প্রমুখ মহিলা সাহাবীগণও ফতোয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করতেন। মর্যাদাসম্পন্ন বহু পুরুষ সাহাবী তাঁদের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন এবং তাঁদের ফতোয়া মেনে নিতেন। তিরমিযী শরীফে আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সূত্রে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, ‘‘আমাদের মাঝে যখনই কোনো হাদীসের বিষয় নিয়ে সমস্যা দেখা দিত, আমরা তখনই আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার নিকট জিজ্ঞাসা করলে তার সমাধান পেয়ে যেতাম।’’

ইলমে দীন শিক্ষা লাভ করার জন্য ইসলাম নারী জাতিকে শুধু সুযোগই দেয়নি বরং ফরয করে দিয়েছে। পুরুষগণ যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ‘ইলমে দীন শিক্ষা লাভ করতো, তেমনি মহিলাদের জন্যও ‘ইলমে দীনের শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রীতদাসীদেরকেও শিক্ষা দেয়ার জন্য নির্দেশ দান করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) তাঁর সহীহ্ বুখারী গ্রন্থে মহিলা শিক্ষা সম্পর্কে পৃথক একটি শিরোনামও দিয়েছেন। যার বিশ্লেষণের দ্বারা নারী শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থারই গুরুত্ব বোঝা যায়। সাহাবা এবং তাবে‘য়ীদের যুগেও বিকল্প পন্থায় মহিলাদের ইসলামী শিক্ষার প্রচলন ছিল। সে যুগে মহিলাদের মধ্যে বড় বড় বিদূষী, বিজ্ঞানী এবং হাদীসবেত্তা বিদ্যমান ছিলেন। আয়েশা, আসমা, উম্মে দারদা, ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুন্না প্রমুখ মহিলা সাহাবীদের ‘ইলমে যোগ্যতা ও ইসলামী আইন বিদ্যা সম্পর্কে তাবাকাতে ইবনে সা‘দ এবং মুসনাদে আহমদে বিবরণ রয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর নিকট হতে অনেক সাহাবী ও তাবে‘য়ী দীনের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।’’ এ হাদীসে কুরআনের ‘ইলম শিক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে। আর এ শিক্ষা পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের জন্য সমভাবে প্রয়োজন। প্রখ্যাত জ্ঞানপ্রবর মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বেহেশতী জেওর নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ ‘‘এলাকার মুসলিম মহিলাদেরকে একত্র করে দীনি শিক্ষা দেয়া একান্ত দরকার।’’ শুধু নামায রোযার আহকাম, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও সামান্য তাসবীহ-তাহলীল জানলেই ইসলামী জ্ঞানার্জন হলো না, বরং ইসলামী আকাইদ, ইবাদত, ব্যবহারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের বিধি-বিধানের ‘ইলম অর্জন করা এবং অপর মুসলিমকে শরীয়তের অনুসরণে সংশোধন করা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই জরুরী। দীনের শিক্ষা ছাড়া বিধি-বিধানের সংস্কার সম্ভব নয়।

অমিয়া বাগদাদী নাম্নী জনৈকা মহিলা মদীনাতে ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট ‘ইলমে হাদীস এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট ‘ইলমে ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন। এমনিভাবে ইসলামের প্রথম যুগে মহিলারা হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ এর বিশদ জ্ঞান অর্জন করে দীনের প্রচারণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আর এ শিক্ষা ব্যবস্থা ও

প্রচারণা পর্দাহীনভাবে হয়নি। বরং পর্দার মাধ্যমেই হয়েছে। ‘‘মাদখাল’’ নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, অতীতে মুসলিম মনীষীদের পত্নীগণ ইসলামী শরীয়তের বিষয়াদি লিখে মহিলাদের নিকট ব্যাপকভাবে প্রচার ও শিক্ষাদান কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যার ফলে তাঁদেরই গর্ভে বড় বড় আলেম, ফকীহ ও ইমামের জন্ম হয়। যাদের দৃষ্টান্ত বর্তমান বিশ্বে দূর্লভ। পুরুষদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সকল সুযোগ-সুবিধা আছে পর্দাজনিত কারণে মহিলাদের ক্ষেত্রে তা নেই। স্বাভাবিকভাবেই তাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সীমিত। কাজেই পুরুষদের মত মহিলাদেরও বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতি থাকা দরকার। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বলেনঃ ‘‘এ সকল ফিতনা বা অসুবিধার জন্য শিক্ষা দায়ী নয়, বরং শিক্ষা পদ্ধতি অথবা পাঠ্যক্রম কিংবা ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনাই একমাত্র দায়ী।’’ সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত ইসলাম বিরোধী তথা মানবতা বিরোধী সহশিক্ষার বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতঃ মুসলিম মহিলা শিক্ষার ব্যবস্থা ব্যাপক করা এবং মহিলাদের চরিত্র গঠনসহকারে শরী‘আতের নীতি অনুসারে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম মহিলা বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো দরকার।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্র ও সীমা :

মূল শিক্ষা দীক্ষার দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য শিক্ষার ক্ষেত্র ও প্রকারে পার্থক্য থাকা আবশ্যক। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো উহার দ্বারা তাকে উৎকৃষ্ট স্ত্রী, উৎকৃষ্ট মাতা, গৃহিণীরূপে গড়ে তোলা। যেহেতু তার প্রকৃত কর্ম ক্ষেত্র গৃহ, সেহেতু তাকে এমন শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যা এ ক্ষেত্রে তাকে অধিকতর যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারে।
উপরন্তু তার জন্য ঐ সকল জ্ঞান- বিজ্ঞান শিক্ষা করা প্রয়োজন যা তাকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলতে সক্ষম । তার চরিত্র গঠন ও সামাজিক জীবন যাপনের যাবতীয় বিধি বিধান জানার সুযোগ পায় এ ধরনের শিক্ষা প্রত্যেক নারীর জন্য অপরিহার্য।

অতঃপর যদি কোন নারী অসাধারণ প্রজ্ঞা ও যোগ্যতার অধিকারিনী হয় এবং এ সকল শিক্ষা দীক্ষার পর ও অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়, তা হলে

ইসলাম তার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না, কিন্তু শর্ত হলো সে যেন শরিয়তের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করে।

আসলে নারীর সৃষ্টি উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাকে আদর্শ মা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এ প্রাকৃতিক সত্যের ওপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন। কারণ আল্লাহর সৃষ্টির একটা মহৎ উদ্দেশ্য থাকে; মানবজাতির কল্যাণই সে সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এ জন্যে আমরা যদি নারীকে তার প্রকৃত দাবি মোতাবেক আসল শিক্ষা না দেই, তা হলে অন্য শিক্ষার মাধ্যমে সে একজন আদর্শ নারী, আদর্শ মা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। অথচ আদর্শ মা হওয়ার মধ্যেই নারীর মূল সার্থকতা নিহিত রয়েছে।

ইসলাম নারীর জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন বিষয়কেই নিষিদ্ধ করেনি, কিন্তু কোন জ্ঞান নারীর স্বভাবসম্মত এবং নারীর জন্য প্রয়োজনীয় তাকে স্থির করে নিতে হবে। তবে এসব জ্ঞান অর্জন করার সময় তাকে শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকেই অর্জন করতে হবে।ইসলাম সহশিক্ষাকে কখনও অনুমোদন করে না, এ কারণে নারীদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, যাতে করে তারা শরিয়তের সীমার মধ্য থেকেই যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জন করতে পারে।

নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার শর্তাবলি

শিক্ষা-দীক্ষা ও যে কোন প্রয়োজনে নারীর ঘর থেকে বের হতে পারবে। তবে ইসলাম সেখানে কিছু শর্ত আরোপ করেছে।

১. বের হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী আদব রক্ষা করে বের হতে হবে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা গৃহভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদের প্রদর্শন করবে না"।

(সূরা আহযাব : ৩৩)

রাসূল (সা) বলেন, 'তোমাদেরকে প্রয়োজনে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হলো'।

(বুখারী)

২. স্বামী, অভিভাবক, পিতা ও মাতার অনুমতি নিয়ে বের হতে পারবে।

৩. হিজাব পরিহিতা অবস্থায় বের হতে হবে। "হে নবী আপন বিবি, কন্যা এবং মুমিন মহিলাদের বলে দিন তারা যেন তাদের শরীর চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখে।" (সূরা আহযাব : ৫৯)

৪. সুগন্ধি লাগিয়ে বের হতে পারবে না। রাসুল (সা) বলেন, 'যে নারী সুগন্ধি দ্রব্যাদি ব্যবহার করে লোকের মধ্যে গমন করে সে একজন ভ্রষ্টা নারী।' (তিরমিযি)

৫. রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলা যাবে না।

৬. ভদ্র ও নম্রভাবে হাঁটতে হবে, যাতে করে জুতার শব্দ মানুষ শ্রবণ করতে না পারে। আল্লাহ বলেন, "তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।' (সূরা নুর -৩১)

৭. অপরিচিত লোকদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে তা যেন স্বাভাবিক ভাবে বলে। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষদের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সে ব্যক্তি কু-বাসনা করে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে।' (সূরা আহযাব : ৩২)

৮. একান্তে কোন অপরিচিত লোকের ঘরে বা দোকানে যেন প্রবেশ না করে। 'রাসূল (সা) বলেন, একজন নারী ও পুরুষ যেন একান্তে কোন ঘরে না বসে তাহলে তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে হয় শয়তান। (তিরমিযি)।

নারীর দ্বীন শিক্ষা না করার ক্ষতি:

বর্তমান সময়ে অধিকাংশ অভিভাবকই শংকিত তার সন্তানকে নিয়ে। কেননা সুশিক্ষার অভাবে আজ ছেলে বাবার কথা শুনছে না, মেয়ে মায়ের কথা মানছে না। পশ্চিমা ভাবধারায় চলতে গিয়ে তারা আজ নিজেদেরকে ঠেলে দিচ্ছে শৃংখলহীন এমন এক জীবনের দিকে, যেখানে পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, মানুষের বংশপরিচয় বিলুপ্তির পথে, পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের সংখ্যা বেড়ে চলছে, যিনা–ব্যভিচারের ফলে ব্যাপক হারে বাড়ছে নতুন নতুন রোগ–ব্যাধি, লজ্জা–শরমের মতো চারিত্রিক মহাসম্পদ সমাজ থেকে ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে।অবশেষে বয়স বাড়ার পর মহিলাদের জীবন নিজের জন্যই বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পশ্চিমা সভ্যতা, যাদেরকে আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশ এবং সুখী মানুষ বলে মনে করি, যেখানে যেতে পারা, বসবাস করতে পারা অথবা সেখানে যেতে না পারলেও অন্ততপক্ষে নিজের দেশে থেকে তাদের সাংস্কৃতি অনুযায়ী চলতে পারাকে আমরা অনেকেই নিজেদের জাগতিক সফলতার চাবিকাঠি মনে করে থাকি। অথচ তাদের জীবনের সচরাচর বাস্তব অবস্থা হলো এমন, যা আমি সংক্ষিপ্তাকারে উপরে উল্লেখ করেছি।

অপরদিকে ইসলামি সভ্যতার ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া লোকগুলোর জীবন আচার, চলাফেরা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। দ্বীনের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার ফলে একটা গরীব থেকে গরিব লোকও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রাণ ভরে, কোরআন–হাদিসের পড়শে তার জাগতিক জীবনে সে অনুভব করে এক অনাবিল প্রশান্তি। আর এটা, যে যতটুকু কোরআন–হাদিস অনুযায়ী চলে, যে দ্বীনের ছায়াতলে যতটুকু আশ্রয় নেয় এবং যে যতটুকু কোরআন–হাদিস অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করে, সে ততটুকু অনুভব করতে পারে।

সুতরাং একটা পরিবারকে দ্বীনের সুশীতল ছায়াতলে আনার জন্য, সেই পরিবারকে ইসলামিক পরিবার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য, নারীর কোন বিকল্প নেই। অপরদিকে কোন নারী যদি নৈতিকতাহীনভাবে সমাজে চলাফেরা করে, তাহলে তার একজনের

ক্ষতি আরও দশটা নীতিহীন পুরুষের ক্ষতির চেয়েও অনেকগুণ বেশি হয়ে থাকে। তাই ফিতনামুক্ত দ্বীনি পরিবেশের সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে নারীর জন্য দ্বীনি শিক্ষার বিকল্প নেই ।

কেননা যে পথে বিপর্যয় আসে সে পথেই তা রোধ করতে হয়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, সেদিকে আমরা তেমন একটা মনোযোগ দেইনি। ইসলামের শুরু যুগে শিক্ষা ও দাওয়াতের কাজে নারীসমাজের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, সাহিত্য ও ইসলামের প্রচার—প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখত তারা। অথচ বর্তমানে আমাদের মানসিকতা এমন হয়েছে যে, কেবল রান্না—বান্না করা, স্বামীর খেদমত করা ও সন্তানের লালন—পালন করা, অনেকে আবার আধুনিকতা ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামে অফিস—আদালত, রেস্টুরেন্ট বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে পাড়াকে'ই মহিলাদের কাজ মনে করে থাকে।

অবশ্য মহিলারা যদি উপরোক্ত কাজসমূহ শরয়ী বিধান অনুসারে করে থাকে, তাহলে অবস্থাভেদে এগুলোও তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও সাওয়াবের কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু শরয়ী বিধান অনুসারে কোন কাজ করতে হলে তো তাকে আগে শরয়ী বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অথচ সেদিকে আমাদের কোন গুরুত্ব'ই নেই।

সহ –শিক্ষা: কোনো যুবক-যুবতী যুগলকে যদি অবাধ মেলামেশা ও সহাবস্থানের সুযোগ করে দিয়ে বলা হয়, তোমরা কেউ কারো প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না- তাহলে এ উপদেশও কখনও ফলপ্রসূ হতে পারে না। সহশিক্ষার কুফল কি হতে পারে তা আর ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সহশিক্ষা ব্যবস্থা গোটা মানবজাতিকে যে অকল্যাণ, অবক্ষয় এবং অশান্তি দান করেছে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেও মানুষ এ থেকে মুক্তির কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। কারণ, মানব রচিত আইনে এ সমস্যার কোনো সমাধান নেই। আছে শুধু সমস্যা বৃদ্ধির অসংখ্য উপায়। সহশিক্ষা ব্যবস্থা মানব জাতির যে ভয়াবহ ও অপূরণীয় ক্ষতি করেছে তন্মধ্যে নৈতিক চরিত্রের অবনতি, দাম্পত্য জীবনে চরম অশান্তি, অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম, যৌতুক প্রথা, তালাক, নারী ধর্ষণ, নারী হত্যা, মাদকদ্রব্যের

অবাধ ব্যবহার, অযোগ্য সন্তানের প্রাদুর্ভাব, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সহশিক্ষার কারণে নৈতিক চরিত্রের যে অবনতি ও অবক্ষয় হয়েছে তা বর্ণনাতীত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েরা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়। ফলে তারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে।

সহশিক্ষার কুফল হলো দাম্পত্য জীবনে অশান্তি। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যেক ছেলে ও মেয়ে বহু ছেলেমেয়ের সাথে অবাধে কথা বলার এবং যথেচ্ছা মেলামেশার করা সুযোগ পায়। এ অভ্যাসের কারণে সহপাঠী ও সহপাঠিনী ছাড়াও বাইরের ছেলেমেয়েদের সাথে তাদের অবাধ মেলামেশা চলে। এদের মধ্যে যার সাথে তথাকথিত প্রেম জমে ওঠে, তার সাথে বিয়ে না হলে, বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে মেনে নিতে পারে না। সারা জীবন চলে পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবোঝি। কেউ কাউকে বরদাশত্ করতে পারে না। আবার প্রেমের বিয়ে হলে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণের চেয়ে বিকর্ষণই ঘটে বেশি। এভাবেই সৃষ্টি হয় গরমিল আর পরিণামে ঘটে মর্মান্তিক ঘটনা- তালাক।

সহশিক্ষার বদৌলতে মেলামেশার কারণে একই সময়ে একজন যুবক কিংবা যুবতী অনেকের সাথে সম্পর্ক গড়ার সুযোগ পায়। একই নারী বা পুরুষকে নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। কেউ আবার একজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পর তাকে বাদ দিয়ে অপর একজনকে পেতে চায়। এর ফলে শুরু হয় রেষারেষি, এসিড নিক্ষেপ, খুন-খারাবি ইত্যাদি।অতএব, গোটা জাতিকে আল্লাহর গযব, অপূরণীয় ক্ষতি, ধ্বংস এবং বিপর্যয় থেকে সর্বস্তরে পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা জাতীয় কর্তব্য।

নারীর দ্বীন শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ: নারীর উপর দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা করার এই ফরয আদায় করার বিভিন্ন পন্থার সাথে সাথে যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমানে মেয়েদের জন্য মহিলা মাদরাসায় অধ্যয়ন করাও সহজ একটা মাধ্যম। কেননা যদিও আমাদের পূর্বসূরীদের পন্থা ছিল যে, তারা নিজেদের মেয়েদেরকে ঘরেই তালিম দান করত এবং নিজেরাই শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতো।

কিন্তু যুগ পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বর্তমান বাবা—মায়েদের জন্য সেই ফুরসত হয়ে ওঠেনা, তাছাড়া বর্তমান বাবা—মায়েদেরও ঐরকম দ্বীনি জ্ঞান না থাকার কারণে তারা নিজেরাই থাকে দিকভ্রান্ত। এহেন পরিস্থিতিতে দ্বীনের উপর চলার জন্য যে ইলম অর্জন করা জরুরি, তার জন্য বর্তমানে মহিলা মাদরাসাগুলোর ভূমিকা অপরসীম।

বর্তমানে এই মাদরাসাগুলো নারীদের দ্বীনি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সারা দেশে এর শাখা—প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে এবং এগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের মেয়েরা দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ।

কিন্তু বর্তমানে নারী জনসংখ্যার তুলনায় মাদরাসায় পড়–য়া নারীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। অপরদিকে বিশাল এক সংখ্যা রয়ে যাচ্ছে যারা স্কুল, কলেজ—ভার্সিটিসহ বিভিন্ন ধরণের সহশিক্ষা ও সহাবস্থানের পরিবেশে পড়াশোনা বা অবস্থান করছে। তারা যদিও বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি ও দুনিয়াবি উন্নতি অর্জন করছে, কিন্তু দ্বীনি বিষয়ে এতটা অনবগত যে, দেখে দেখে কোরআন পড়তেও অক্ষম এবং নিজেদের একান্ত প্রয়োজনীয় মাসায়িলগুলো সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অনবগত। এমন নারীদের জন্যেও দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যান্ত জরুরি। চাই তা রাষ্ট্রীয়ভাবে হোক বা তাদের অধ্যয়নরত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে, অথবা কারো ব্যক্তিগত উদ্যোগে। যেভাবেই হোক না কেন, প্রতিটি স্তরের প্রতিটি বয়সের, প্রতিটি নারী—পুরুষের জন্য দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি।

তবে আশার বাণী হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে না হলেও, সামাজিক বা ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ বা বাসা কেন্দ্রিক নারী—পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দ্বীনি শিক্ষার জন্যে উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে এটা আরো ব্যাপক ও সুশৃংখলতার সহিত হওয়া উচিত। বিশেষ করে সহীহ পদ্ধতি অবলম্বন করে স্কুলগুলোতেও দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। যতদিন পর্যন্ত খেলাফত পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত অন্তত দ্বীনকে টিকিয়ে রাখতে, মানুষের মধ্যে দ্বীনী ইলম বিস্তার করার ক্ষেত্রে সামাজিক বা ব্যক্তিগত এসব উদ্যোগের বিকল্প নেই।

আধুনিক যুগে ইসলামী অনুশাসন মেনে নারী শিক্ষার প্রয়োগ: আমাদের রসূল (স) যুগ থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করি নারীদের ঘরে অবস্থান করাই সর্ব যৌক্তিকতা সম্পন্ন মতামত। সেটা আধুনিক যুগের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। প্রয়োজনের তাগিদে ও মাহরামের অনুপস্থিতিতে তারাও উপার্জনক্ষম হতে পারে।

আধুনিক যুগে ইসলামী অনুশাসন মেনে মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োগিক দিক হলো— পর্দা ও শালীনতা বজায় রেখে এবং মাহরামের সাহচর্য ও অনুমতি সাপেক্ষে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও পেশাগত দক্ষতা অর্জন করা। এতে একদিকে যেমন নৈতিক মূল্যবোধ সংরক্ষিত হয়, অন্যদিকে সমাজ গঠনে নারীরা অবদান রাখতে সক্ষম হন।আধুনিক যুগে ইসলামী অনুশাসন মেনে মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োগিক দিকগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

সেবামূলক পেশায় নিয়োজন: ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের জন্য চিকিৎসাসেবা (যেমন: গাইনেকোলজি, পেডিয়াট্রিক্স), নার্সিং এবং শিক্ষকতা অত্যন্ত উপযোগী পেশা। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নারীরা এসব খাতে ক্যারিয়ার গড়ে পর্দা ও শালীনতার সাথে সেবা প্রদান করতে পারেন।পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়ন:শিক্ষিত মায়েদের দ্বারা পরিচালিত পরিবারে আদর্শ ও নৈতিকতাসম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে ওঠে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারীরা সন্তানকে ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে সঠিক শিক্ষা প্রদান করতে পারেন।

নারীকেন্দ্রিক উদ্যোক্তা ও অর্থনীতি: অনলাইনভিত্তিক ব্যবসা, ফ্রিল্যান্সিং বা ঘরে বসে করা যায় এমন কাজের মাধ্যমে নারীরা স্বাবলম্বী হতে পারেন। আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে পরিবারের অর্থনৈতিক সহযোগিতায় তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

ইলমে দ্বীন বা ধর্মীয় জ্ঞানচর্চা: পবিত্র কুরআন-হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নারীরা আধুনিক যুগের নানাবিধ ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে পারেন এবং অন্য নারীদের সঠিক পথের দিশা দিতে পারেন।

ডিজিটাল মাধ্যমে দাওয়া ও নেতৃত্ব: আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ঘরে বসেই নারীরা সোশ্যাল মিডিয়া বা ব্লগের মাধ্যমে সঠিক ইসলামী অনুশাসন প্রচার করতে পারেন।

বিভিন্ন লেখালেখি ও গবেষণার মাধ্যমে তারা সমাজে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারেন।ইসলাম সবসময় নারীদের জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করেছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নারীরা যাতে শরীয়াহর বিধান মেনে নিজ নিজ মেধার সর্বোচ্চ প্রয়োগ করতে পারেন, তার জন্য পরিবার ও সমাজ থেকে ইতিবাচক পরিবেশ ও সহযোগিতা প্রদান করা প্রয়োজন।

উপসংহার:

ইসলাম সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। এই মহান দ্বীনের অনুশাসন নারী জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর স্পর্শে এনেছে। আজ সারা বিশ্বে নারী শিক্ষা আন্দোলন জেগে উঠেছে। নারী চায় সমাজে পুরুষের পাশাপাশি সমান অধিকার। ইসলামও নারীর এই অধিকারকে অস্বীকার করে না বরং স্বাগত জানায়। পুরুষ জাতির পাশে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য নারী জাতি শিক্ষাঙ্গনে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে প্রবেশ করে। শিক্ষাঙ্গনে নারীর এই প্রবেশে ইসলাম বাধা দেয়নি।

এখন সারা মুসলিম জাহানে নারী তাদের ন্যায্য অধিকার প্রায় সাবলীলতার সঙ্গে ভোগ করছে। তারা সব রকমের বিদ্যা নিকেতনে সমাজের প্রয়োজনীয় জ্ঞানর্জনে নিয়োজিত আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত নারী জাতির যাতায়াত এখন প্রায় অবাধ। নারী এখন শিক্ষিকা, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, নার্স, সমাজসেবী, বৈজ্ঞানিক। নারী এখন তাদের কাজ পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমাপন করার জন্য প্রস্তুত, শিক্ষাঙ্গনে নারীর স্বাভাবিক যাতায়াত নিশ্চিত না হলে সমাজের সর্ব প্রকার উন্নতিতে পুরুষকেই হাত লাগাতে হতো, ফলে তার এই প্রচেষ্টা পুরোপুরিভাবে কোনো দিনই সার্থকতা লাভ করতে পারতো না। ইসলামে নারীর এই স্বাধীনতা খর্ব করার নীতি নেই। নারী তার প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করবে এবং তার এই প্রবেশকে ইসলাম স্বাগত জানায়। তবে লজ্জাই নারীর ভূষণ। নারী যদি লজ্জা বিসর্জন দিয়ে সমাজের কাছ থেকে জোর করে তার অধিকার পেতে চায়, তবে ইসলাম তার এই কাজেই বাধ সাধবে। শালীনতা বিবর্জিত কোনো কাজই ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলাম উদার নীতি পোষণ করে, কিন্তু এই উদারতার সুযোগ নিয়ে নৈরাজ্য

সৃষ্টিকে ইসলাম কঠোরভাবে সমালোচনা করে। শিক্ষা অন্বেষণের দোহাই দিয়ে কোনো নারীকেই তার শালীনতা ও সতীত্ব বিসর্জন দেওয়াকে কিছুতেই অনুমোদন করে না। শিক্ষার পবিত্র অন্বেষণকে ইসলাম সর্বদা উৎসাহ দিয়ে এসেছে, ভবিষ্যতেও দেবে।

আমাদের মুসলিম মেয়েরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা জ্ঞানী-গুণী মা বোনেরা তথাকথিত প্রগতিবাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি দূর্নিবার আকর্ষণে মোহাবিষ্ট হয়ে শাশ্বত সুন্দর জীবনাদর্শ ইসলামী আইনকে কুসংস্কার ও ইসলামের নির্দেশিত পর্দাকে অবরোধ বলে অবজ্ঞা করে দূরে সরে থাকছেন। তাঁরা বুঝতেন না যে, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণেই এবং এ জীবনাদর্শ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবেই আজকে নারী সমাজের অধিকার ও মর্যাদা সাধারণভাবে ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। মানব রচিত মতবাদ ও চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহক হয়ে কি পেয়েছেন তারা?

বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৯০ জন মানুষ ইসলাম অনুসারী। অতীতের বিবেচনায় বিদ্যানিকেতনগুলোতে মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শতকরা হারে শিক্ষিত জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। মেয়েদের জন্য অনেক স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে এটা একটা আশাব্যঞ্জক নিদর্শন, সন্দেহ নাই। এই নিদর্শনের পবিত্রতা রক্ষিত হলে ইসলাম একে স্বাগত জানাবে। তবে পবিত্রতা রক্ষার অপারগতার পরিচয় দিলে ইসলাম একে কোনো দিনই অনুমোদন দিবে না। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে আমরা মাঝে মাঝে এমন কিছু ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি যা ইসলাম কোনভাবেই অনুমোদন করে না। ছেলেমেয়েদের শালীনতা বর্জিত মেলামেশা এমন একটি পর্যায়ে ঠেকেছে যে, শুধু ইসলাম কেন, পরিবর্তনশীল দুনিয়ার কোনো ধর্মই একে অনুমোদন দিবে না। আমরা আশা করি, আমাদের নিরক্ষর জনসমুদ্র দ্রুত নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। তবে ইসলামী অনুশাসন যাতে তার বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনার বান নিক্ষেপ করতে না পারে, তার ব্যবস্থা আমাদেরকে সতর্কতার সাথে করতে হবে। ইসলামের সাম্য নীতি যাতে কোনো অশালীন প্রক্রিয়ার মাঝে বিলীন হয়ে না যায়, তার ব্যাপারে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। বাংলাদেশের নারী শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের এ সত্য মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে।

শরীয়তের অনুমোদিত উপায়ে 'জেন্ডার বৈষম্য' মুক্ত হয়ে মানব সম্পদের এই বৃহৎ অংশ নারী জাতির উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রয়াস ইসলাম গোড়া থেকেই চালিয়ে আসছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও তৎপরতাকে ইসলাম কল্যাণকর মনে করেছে। তাই শিক্ষার মাধ্যমে নারী সমাজের উন্নয়ন ইসলামের একান্ত কাম্য।

যুগের অবস্থার প্রতি খেয়াল রেখে মুসলিম নারীদের শিক্ষিত করে তুলতে হলে এবং তাদেরকে ব্যভিচার, ধর্ষণ ও নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে সারা দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয়, মহিলা মাদ্রাসা ও মহিলাদের জন্য সতন্ত্র সাধারণ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা অতীব প্রয়োজন, যেগুলো মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হবে। পরিশেষে সবাইকে, বিশেষ করে বিদূষী নারী সমাজের প্রতি আহবান জানাচ্ছি জ্ঞানের পথে এগিয়ে আসতে হবে এবং স্ব-স্ব বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করে ও ইসলামী বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করে ইসলামের উন্নয়ন সাধন করতে। সবাই যেন উজ্জ্বল নক্ষত্র হবার চেষ্টা করি।